

সুন্দরী, সুন্দরী

আমতলা ছাড়িয়ে কোণাকুণি রাস্তাটায় পা দিতেই পিছন থেকে কয়েকটি ছেলেমেয়ে চিৎকার করে ওঠে, সুন্দরী, সুন্দরী!

ওরা দৌড়ে কাছে এসে সুর করে ছড়া কাটতে থাকে। একটি দুষ্ট ছেলে টান মারে কোমরে গোঁজা কাপড়ের গাঁটে। বুড়ি নিমষের জন্যে একবার তাকালো। সুতো দিয়ে লতা-পাতা আঁকা একটি ছোট্ট থলে হাতে দাঁতহীন মুখে পান চিবোতে চিবোতে চলতে থাকে নির্বিকার। ছেলেপুলেদের অত্যাচারে রাগলে চলে না। তাছাড়া এই ছেলেদের দাদার আমল থেকে এসব মন্তব্য এত শুনে আসছে এখন আর এগুলোতে কান দেয়ার প্রয়োজন-বোধ করে না। আসল নাম ছিল বুবি, গায়ের রং কুচকুচে কালো, তাই বোধ হয়, গ্রামের কোন রসিকপুরুষ তার নাম দিয়েছিল সুন্দরী। তার আসল নাম এই নামের তলায় চাপা পড়েছে অনেকদিন।

এই নামটা ছেলেবুড়ো অনেকেরই কাছে প্রিয়। রসিকতা করার জিনিশ। আজ দু'দিন ধরে গ্রামে একটা চাপা আশংকা এবং উত্তেজনা বিরাজ করলেও, যে-কেউ তাকে দেখেছে, একটু তামাশা করতে ছাড়েনি।

তার গলায় সেকেলে পুঁতির মালা। পরনে বহু পুরনো একটি দিশি কাপড়। এই কাপড়টা এককালে বাবুরহাটের শাড়ি ছিল, এখন তেনায় পরিণত হয়েছে। ডানহাতে মনকাঁটার ডালার মাথা-বাঁকানো লাঠি। গায়ের চামড়া ছোট ছোট ভাঁজে ঢিলে হয়ে গেছে, শরীরের গড়নটা এমনই প্রকাণ্ড যে, আদ্দিকালের পাহাড়চারী বনমানবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। থুতনির নিচে থলথলে গোস্ত ঝুলছে, হাতের হাড়গুলো পুরু পুরু। অনেকে দেখে ভাবে, বুড়ি হয়েছে এখনো এমন, আর জোয়ান ছুকরি যখন ছিল তখন না জানি কেমন ছিল। আগেকার দিনে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারাটি ছিল এ-গ্রাম থেকে পাকা দেড় মাইল দূরে। তার পানি এমনই পরিষ্কার টলটলে ছিল যে, লোকে বলতো ডালিমের রস, এক গেলাস খেলেই মনপ্রাণ জুড়ায়। তখন বুবির টস্‌টস্‌ জোয়ানকাল। প্রত্যেকটিতে আধমণ করে পানি ধরে এমন দুই মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে আসতো, একটুও ক্লান্তি বোধ করত না। আফেন্দি ছিল গ্রামের সেরা লাঠি খেলোয়াড়। বিয়ে হওয়ার দু'বছরের মধ্যে স্বামী মারা যাওয়ায় বুবিকে থাকতে হত একলা ঘরে। এক অমাবস্যার রাত্রে বাঁশের দরজাটা কেটে ঢুকে আফেন্দি বসে গিয়ে ওর বিছানায়। তার নিশ্চয় কু-মতলব ছিল। বুবি টের পেয়ে খপ্‌ করে ধরে ফেলে তার কব্জিতে, এরপর দাঁড়িয়ে উঠে এক ধাক্কায় ফেলে দেয় তাকে উঠোনে। আফেন্দি অজ্ঞান হয়ে যায়। বুবি বাতি জ্বেলে বাইরে এসে দেখে, সে চোখ উলটিয়ে পড়ে আছে। পরে তেলপানি দিয়ে যত্ন করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো তার। বলল, আফিন্দা, এই তাকত লইয়াই আইছিলি বুবির কাছে!

এইসব কাহিনী বুড়োদের অনেকের মনে আছে।

সামনে একটি বড়ো ছাউনি। তার পাশ দিয়ে পায়ে - হাঁটা পথ। ছাউনির আশে পাশে ঘন আমবন। ডালপালার ফাঁক দিয়ে ওপরে উড়ছে ধোঁয়া, যা দেখা যায় বহুদুর থেকে। আমবনটি গ্রামের বাইরে হলেও , কাছাকাছি। ওর একদিকে কয়েকটি পাকা ভিটি, কিন্তু উপরে ঘর নেই। পোড়া কাঠ, আসবাবপত্র, কাগজের স্তূপ ইতস্তত ছড়ানো। একেক জায়গায় কালো হয়ে

জমেছে ছাই। দেখলেই বোঝা যায়, ঘরগুলো বেশিদিনের পোড়া নয়।

একটা আমগাছের নিচে এসে সুন্দরী লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। গাছের ছায়ায় ফুরফুরে হাওয়া আরাম লাগছে। লাঠিটা গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে, ও বসে একটা শিকড়ের ওপর। আরেক খিলি পান খেয়ে নেয়া যাক্। কোমরে গোঁজা পানের খুতিটা ঝুলছে, এমন সময় ছাউনির ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসে। গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। পরনে শাদা ধুতি। চেছে কামানো থুতনিতে খুরের দাগ। কোটরে বসে যাওয়া তার দুই চোখে তীক্ষ্ম সন্ধানী চাউনি। বিড়াল যেভাবে ইঁদুর ধরতে যায়, তেমনি সতর্ক পা'য়ে এগিয়ে আসছে লোকটা। চতুর্দিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই, কেবল দেখা যায় গ্রামের প্রান্তে কতকগুলো ছেলেমেয়ে বসে বসে জটলা করছে। মাঠও শূন্য। ধানক্ষেতগুলো দুপুরের রোদে হেলছে দুলছে হাওয়ায়। লোকটা কাছে এসে জুতোয় একটা শব্দ করে ডাকলো, এই বুড়ি!

কেডা তুমি? মুখ নিচু রেখেই খুতি থেকে পান-সুপারি খুলতে খুলতে জিগগেস করে সুন্দরী। গলার স্বর ঠাণ্ডা, আর গম্ভীর।

বুড়ির কথা বলার ধরন দেখে বিকৃত হয়ে উঠে লোকটার মুখ। মনের ভাবটা দমিয়ে রেখে বলে, আমি কেডা তা পরে জানতা পারবা। আও, তোমার লগে কিছু কতা আছে।

পানের থলেটা উরুর ওপর রেখে এইবার সুন্দরী মুখ তুলে চায়। মিটমিট করে ভালরূপে দেখলো, মুখটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কাছারির নায়েব নাতো? কিন্তু তার সঙ্গে কি কথা থাকতে পারে? সুন্দরী জিগগেস করল, আমার লগে আবার কি কতা? অনেকদূর যাওন লাগবো। দেরি করতাম পারি না।

লোকটা হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে বলে না, একটুও দেরি অইত না।

তাইলে কও হুনি।

আসল কথা পাড়বার আগে খাতির জমাবার জন্যেই যেন লোকটা জিগগেস করে, অত তাড়াতাড়ি যে। তুমি কই যাইবা?

যাইয়াম আমার মার বাড়ি, আৎকাপাড়া। সুন্দরী পান মুখে ঠেসে দেয়।

লোকটা হাসে, ভাবে, সত্তর বছরের বুড়ি, তার আবার মায়ের বাড়ি! আড়াই মাইলের দূরত্বটা যেন কিছুই নয়, এমনি ভাবে দেখিয়ে বলে, ও, তা আর কদ্দূর। লও যাই।

সুন্দরী বিরুক্তি প্রকাশ না করে উঠে দাঁড়ালো। লোকটা আগে আগে চলে, আর ও তার পিছনে। তাঁবু কাছেই, রাস্তা থেকে হাত বিশেক দূরে। সেখানে ইট দিয়ে তৈরী চুলোর ওপর বড়ো ডেকচি চাপিয়ে কি রান্না করছে একজন। ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল, তিনজন তাদের দিকে চেয়ে আছে। ওদের হাতে কি এসব? বন্দুক না? ওগুলোর মাথায় ছুরির মতো ধারালো কি সব চক্‌চক্ করছে! হা, এতো ছুরিই দেখা যাচ্ছে। সুন্দরীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছাৎ করে ওঠে। তা'হলে, না জেনে সেই ভয়ংকর জায়গায় এসে পড়েছে? গতকাল সে চাল তুলতে গিয়েছিলো অন্য গ্রামে, ফিরে এসে রাত্রে শুনেছে সিপাই আসার কথা। সিপাই আসবে কেন, হয়তো পুলিশ। অনেকের সঙ্গে আসার পথে দেখা হয়েছে, অথচ এখানেই যে ওরা তাঁবু গেড়েছে কেউ বলে দেয়নি। বলে দিলে হয়তো সে অন্য পথে যেত। কিছু দেখাও যায় না। যাক্ ভয় করে লাভ নেই। শত হলেও এরাও তো মানুষ? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা জিগগেস করলো, কাছারিঘর কেডা পুড়াইয়াছে? এ-সম্বন্ধে তুমি কি জান?

কেডা আগুন লাগাইয়াছে আমি কেমনে কইয়াম। হেদিন রাইতে দেহি আগুন জ্বলতাছে, আসমানডা এক্কেবারে ফর্সা অইয়া গেছে। হুনলাম, আগুন লাগছে কাছারি ঘরে।

ভাবলাম, বালাই অইলো। পানের রসের ঢোক গিলে বলতে থাকে সুন্দরী, আগুন লাগাইব না? পরজার কইলজা পুইড়া লাইছে না নায়েব সয়তানডা।

থাক্ এসব কথা হুনতাম চাই না! ধমকের সুরে লোকটা বলে, যা জিগাইছি তার জওয়াব দেও।

ধমকাও কারে? মনে করছ আমি তোমারে ডরাই? হক কতা কইয়াম, ডরাম ক্যান্।

ঠিক কতা কইছ। লোকটা কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, তুমি খুব পান খাও, না?

সুন্দরী একটু ঠাণ্ডা হয়ে জবাব দিল, হ। পান আমার খাওন লাগে। অহন ভাত বেশী খাইতাম পারি না তো।

লোকটা জিগগেস করে, ভাত কেডা খাওয়ায়? রোজগারী পোলা আছে?

না। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুন্দরী বলে, মাইনষে দিলে খাই, না দিলে না খাই।

অমন পড়তি বয়েসে অত কষ্ট কইরা লাভ কি। লোকটা তার দিকে নুয়ে ফিসফিস করে বলল, নামগুলা কইয়া দেও। তোমার কপাল ফিরাইয়া দিয়াম।

কেমনে?

বুড়ো আঙুলের সঙ্গে তর্জনীটাকে ছটকা মেরে বলল, টেহা পাইবা, অনেক টেহা।

সুন্দরী কোন কথা বললো না! ক্ষণিকের জন্যে বড় হয়ে ওঠে তার ঝাপসা চোখজোড়া। তাকে নীরব দেখে নায়েব বলতে থাকে, তোমার কোন ভয় নাই। তোমারে কেউ কিছু করতে আইলে—ওই দেহ।

নায়েব বন্দুকধারী তিনজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় সুন্দরীর কাছে। সে চুপ হয়েই থাকে। চোখে বেশী দেখতে পায় না, তবু মনে হয়, তার দৃষ্টি এই আমগাছের ছায়া, ওই ধানখেত ভরা মাঠ, ঝিলিমিলি হওয়ার স্রোতে আর মাঠের শেষে তালগাছের মাথা ছাড়িয়ে দিগন্তে মিশে গেছে। থোকাথোকা শীষ নিয়ে ধানখেতগুলো দুললো, পেঁজা তুলার মতো একখণ্ড সাদামেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তরে উড়ে চলে, আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে আনলো সুন্দরী। তার মুখে পান চিবানো বন্ধ হয়ে গেছে।

কি কও না যে কিছু? আর ভাবতে অইব না। কেউ তোমার আপন নয় তো?

না, আপন না। সুন্দরী বলে, তবে নামগুলা ভুইলা গেছি। নামগুলা কইয়াম। কইয়াম পরে।

লাঠিটা হাতে দিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে হাঁটতে শুরু করে সে। নায়েব পিছন থেকে ডেকে বলে, মনে থাহে যেন।

আধপাকা একটি ধান খেতের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালো, কিসে যেন তাকে পিছন দিকে টানছে। মনটা এলোমেলো হয়ে গেছে তার। সে যাবে নাকি? কিন্তু আজকে উদ্দেশ্য করে রওয়ানা দিয়েছে, মা'য়ের বাড়িতে না গেলে যদি কোন অমঙ্গল হয়? ওদের রুহ বদদোয়া দিতে পারে! পাশাপাশি বড় কাঁঠাল গাছের নিচে বাপজান ও মা'য়ের কবর। ঘন সবুজ ঘাস ও লতাপাতায় জড়ানো। মা'য়ের বুকের সোহাগ এখনো যে ফুল হয়ে ফোটে, বাপজানের আদরের ডাকটি কানে এসে বাজে ; মা'য়ের বাড়ির পথে, পুকুর ঘাটে, আমবনের তলায় তার শৈশবের কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, মাসে দু'তিনবার গিয়ে কবরের পাশে বসে সেগুলো আবার মনে গেঁথে আসে।

মাঝে-মাঝে ভুল হয়ে যায়, মনে হয়, সে যেন সেই ছোট্ট খুকিটি, পরনে রঙের ছোপলাগানো শাড়ি, কানে ফটিকের দোল, গলায় আধুলি ছড়া। হঠাৎ চৈতন্য ফিরে এলে নিজের জন্যে করুণায় মনটা ভিজে যায়।

বাপজানের মৃত্যুর কথা মনে হলে এখনো তার চোখ জ্বলে ওঠে। তিনি ছিলেন জাতচাষী।

মাটির গতর, মাটির সঙ্গেই মিতালি। সেবার ছিল আকালের বছর, শিলাবৃষ্টিতে জমিজমা সব ভেসে গিয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও মহাজনের খাজনা দিতে পারেননি। একদিন কাছারী থেকে পাইক পেয়াদা এল, ঢোল বাজিয়ে জমিজমা সব নীলাম ডেকে চলে গেল। বাপজান সহজে রাগতেন না। তাঁর মেজাজ ছিল এমনি ঠাণ্ডা। কিন্তু এই সঙ্গে অন্যায়ও মুখ বুঁজে সহ্য করতেন না। সত্যের জন্যে জান কোরবান করতে তাঁর আপত্তির কিংবা দ্বিধার কারণ থাকত না। তিনি ওদেরকে মানা করলেন বাড়ির সীমানায় দাঁড়াতে, বললেন, যেমন করেই হোক কয়েকদিনের মধ্যে খাজনা চুকিয়ে দেবেন। কিন্তু ওরা মানা শুনলো না। উলটো চশমখোরের মতো কথা বলতে লাগলো। বাপজান আর স্থির থাকতে পারলেন না। একটা বাঁশ হাতে নিয়ে ছুটে গেলেন। ওরা ছিল দলে ভারী। কাজেই তিনি ওদেরকে কাবু করতে পারলেন না।

বাপজান ওদেরকে মারতে পারেননি, কিন্তু ওরা তাকে মেরেছিল। রাত্রে পাড়াপড়শী যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ছয়-সাতজন পেয়াদা লাগিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এমন মারা মেরেছিল তিনি আর সে ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। তাঁর বুকের ওপর শক্ত কাঠ রেখে সাতটি জোয়ান মানুষ দিয়ে চাপা দেয়া হয়েছিল। অবশ্য পরদিন গ্রামের মাতব্বরদের তদবিরে তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন কিন্তু এরপর আর বেশিদিন বাঁচেননি। লোকে বলে, চাপা খেয়ে তার কলজাটা থেৎলে গিয়েছিল।

জীবনের অনেক গটনা বুবি ভুলেছে, কিন্তু এইটে ভুলতে পারেনি। তার বুকের তলায় একান্তে একটা বিষাক্ত ঘৃণা সে পুষে রেখেছে। সামান্য কারণেই তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

মায়ের বাড়ি থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। আবছা অন্ধকারে ধানখেতের আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার ফিরে আসে তাঁবুর কাছে। আমগাছের নীচে অন্ধকার। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে থাকার পর ছাউনিটা চেনা গেল। তাঁবুর ভেতরে মিটমিটে আলো। তেরপালের ফাঁক দিয়ে তার একটি ফালি বাইরে এসে পড়েছে। বাইরে পাহারা থাকওে পারে, কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে না। সুন্দরী পা টিপে টিপে তাঁবুর কাছে গিয়ে কান পেতে শোনে, ভেতরে মৃদস্বরে আলাপ আলোচনা চলছে। ফাঁক দিয়ে চকিতে একটু চোখ বুলিয়ে দেখল, খাকী পোশাক পরা অনেক মানুষ। তাদের সঙ্গে আছে সেই লোকটা।

হঠাৎ একটা কথা কানে বাজতেই শিউরে উঠল, সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। লাঠি ঠুকে ঠুকে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল গ্রামের দিকে।

পাড়ায় কয়েক বাড়ি পর-পর লোকের জটলা। ছেলেবুড়ো সকলের এই একই আলোচনা, সৈন্য এসেছে। এখানে ওখানে এই একই কানাকানি। কি জানি কি হয়। কাছারিতে কিভাবে আগুন লাগল, কেউ যেন তা জানে না। ওরা শুনেছে, নায়েব মশাই নাকি মোমবাতি জ্বালিয়ে কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল। মোমবাতিটা পুড়তে পুড়তে কাপড়ে লাগে, এরপর দমকা হাওয়া পেয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ; যে ভাবেই লেগে থাকুক, গ্রাম থেকে কেউ যে আগুন নেভাতে যায়নি একথা ঠিক। ওরা পথে এসে দেখেছে, আর হৈ হৈ করেছে। নায়েব শয়তানটা এর সুযোগ নিতে পারে তা তখন কারও মাথায় ঢোকেনি।

পাড়ার একপ্রান্তে ফজর আলি প্রধানের বাড়ি। তার উঠানে লোকের আনাগোনা বেশি। নারকেলের ডাবা থেকে মুখ তুলে প্রধান বললেন, মিয়ারা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। নইলে ভোগান্তি আছে।

ডর কি চাচা, আমরা থাকতে দেহি কোন্ হালা আইয়ে। রাম দাওগুলো বার কইরা রাহেন। বাড়াবাড়ি করলে ভাতিজাদের কল্লা রাইখা দিয়াম।

ফজর আলি প্রধান চিন্তিতভাবে বলেন, রামদাও দা কিছু করুন যাইব না। তুই কাছে যাওয়ার আগেই বন্দুকদা শেষ কইরা দিব।

জব্বর জবাব দেয়, মরি যদি দুই একটা না লইয়া মরতাম না।

কিন্তু মিছামিছি মইরা তো লাভ নাই? হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে ফজর আলি প্রধান বলেন, আগুনডা লাগাইলো কেডা? দুই একজনের লাইগা হগলতে কষ্ট পাইলাম।

একেক সময় উঠানের আলোচনা গরম হয়ে ওঠে, বাইরে বড় বড় কথা বললেও সকলের মনেই কিসের যেন ভয়। একজোট হয়ে দাঁড়ালে মুষ্টিমেয় লোক কিছুই করতে পারবে না, তাদের হাতে থাকুক না বন্দুক। তবু গ্রামের একটি লোকও কেন যে সবাইকে নিয়ে সাহস করে দাঁড়াতে পারছে না, তা বোঝা মুশকিল। নিজের ঘরের ভাত খেয়ে অনর্থক ফ্যাসাদ করতে হয়তো প্রস্তুত নয় কেউ।

কথাবার্তা চলছে এমন সময় সুন্দরী উঠানে এসে হাজির। এত পথ অন্ধকারে কেমন করে হেঁটে এল তাজ্জব লাগে ওর। কেরোসিন কুপির আলো মুখে পড়তেই অনেকে চাইল তার দিকে। ফজর আলি প্রধান জিগ্‌গেস করলেন, বুবি কইথে আইলা?

হে কতাই কইতাম আইছি। সুন্দরী হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে বলতে থাকে, আতকাপাড়া থে আইবার সময়, তাম্বুর কাছে গেছলাম। হুনি, তারা পরামিশ করতাছে আজগা রাইতে গেরাম ঘেরাও করব।

ঘেরাও করব! হঠাৎ যেন কাঁপলো সবাই। তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে লাগল, তারা কয়জন?

নায়েবডা লগে আছে?

বন্দুক না, আর কিছু?

সুন্দরী একমুখে সকলের জবাব দিতে পারে না। হাত নেড়ে জোরে জোরে বলে, তোমরা হগলতে বইয়া পড়! আমি বড় কাইল, সব কতাই কইয়াম।

ঠেলাঠেলি করে বসে সবাই। ঘর থেকে সুন্দরীকে একটা পিঁড়ি আনিয়ে দেওয়া হল। ধীরেসুস্থে এক খিলি পান খেয়ে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে সে। সমস্ত আসর চুপচাপ। পরে উঠল একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন। কিছুক্ষণ আগেও যারা লাফালাফি করছিল, তাদের মুখ থেকেও রা সরেনা কোন।

অহন কি করবার কর। পলাইলে মায়াগো মানইজ্জত থাকব না, কইয়া দিলাম। সুন্দরী উঠতে উঠতে বলে, আমি ঘরেই থাহুম। দেহি আবাগীর বেডারা কি করত পারে।

কথাটা কানাঘুষার মধ্য দিয়ে সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল। যারা খায়নি, তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয় তাড়াতাড়ি। বাইরে ছিল যারা, তারা ঘরে আসে। সবাই পরামর্শ করে কয়েকটি বাড়ি পর-পর একেকটি ঘর ঠিক করে নেয়। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সেই ঘরে গিয়ে জড়ো হয় অন্যান্য বাড়ির মেয়েরা। পুরুষদের কেউ কেউ গিয়ে শোয় ঘরের চালের ওপর বিছানা পেতে, কেউ কেউ চৌকির নিচে আর বেশির ভাগ চলে গেল নৌকায়, এবং নদীর ওপারে। বুকের কলজে পিঠে বেঁধে কেউ কেউ নিজের ঘরেই শুয়ে থাকে। ফজর আলি প্রধানের কথাবার্তাগুলো কেমন রহস্যপূর্ণ, তার মনের ভাবটা কি পরস্পর আলোচনা করে ওরা ঠাহর করে উঠতে পারল না।

বাড়ির পিছনে গোরস্থানের কাছে একটা টিলার ধারে বসে আছে আয়নদ্দি এবং তার সঙ্গে আরো ছয়জন। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না। ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে ওরা। কিছুদিন আগে আয়নদ্দির সঙ্গে নায়েবের ঝগড়া হয়েছিল মুর্গির দাম নিয়ে, বংশ তুলে গাল

দেয়ায় সে একটি থাপড় মেরেছিল তার গালে। এই গ্রামে চারশো ঘর প্রজার মধ্যে আড়াইশ ঘরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করেছে নায়েব, বকেয়া খাজনা পরিষ্কার করছে না বলে। অভাবের বছর, সকলে হাতে পায়ে ধরে পড়েছিল, হাল-খাজনাটা দিয়েই যেন খালাস পায়। কিন্তু জমিদারের ভাগ না দিয়ে জমি দখলে রাখা চলে না।

ইতিমধ্যে এদের সাতজনের জমি দখল করা হয়েছে। পালটা মামলা করার সংগতি নেই, তাই একতরফা রায় হওয়া সত্ত্বেও ওরা চুপ মেরে থেকেছে। গম্ভীর গলায় শবদরালি বলল, আমরা যদি পলাইয়া থাহি তাইলে গেরামের মাইনষের উপরে বেশি অত্যাচার করব।

এতো হাচা কতা।

শবদরালি জিগগেস করে, তাইলে কি করবা?

সব চুপ হয়ে থাকে। সত্যি, এখন কী করা যায়?

আয়নদ্দি শুনতে পেল, বাড়ির ভিতরে ঢুকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। কিছুক্ষণ থেকে ওদেরকে বলে, তোমরা কানখাড়া করে বও। আমি একটু আই।

আয়নদ্দি বাড়িতে এসে দেখে, উঠোনে দাঁড়িয়ে সুন্দরী বুড়ি কোন ভূমিকা না করে বলল সুন্দরী, আয়নদ্দি তোরা চইলা যা গাঙের ওপারে।

আমরা গেলে গা কি বালা অইব? আয়নদ্দি জিগগেস করে।

খুব বালা অইব। নাইলে তোদের কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আয়নদ্দি কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থেকে বলল, আচ্ছা দেহি কি করা যায়।

ওখান থেকে ফিরে এসে পাশের বাড়িতে আগুন আনতে গেল সুন্দরী। ও ঘরেও পুরুষ মানুষ কেউ নেই। দু'বছর ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে কিছুদিন আগে মরেছে জুম্মন। বৌটা বাড়ি বাড়ি ধান ভানে আর এভাবেই কোনমতে আত্মাটা বাঁচিয়ে রেখেছে। কাছাকাছি বাড়ি নেই, সুখে দুঃখে বুড়িই তার একমাত্র ভরসা। ঘরে ঢুকলে বাতাসি মুখ তুলে জিগগেস করে, কি গো নানি এতক্ষণ কই ছিলে?

হ্যা লা বইন, আর কইস না। সুন্দরী সরাসরি জানতে চায়, খাওয়া-দাওয়া করছস?

হুঁ করছি। দুপুরের একমুঠ ভাত আছিল। তাই খাইছি।

তাইলে ল' যাই আমার গরে! একলা এহানে থাহিস না।

ক্যান, আবার অইলো কী? বাতাসি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

কাটা-কাটা কথায় ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়ে দিয়ে সুন্দরী বলে, তুই আ। আমি যাই।

কেরোসিন সব সময় পাওয়া যায় না। মোমবাতির দাম সস্তা। গতকাল একটা মোমবাতি চেয়ে এনেছিল বসিরদ্দির দোকান থেকে। আগুন এনে মোমবাতিটা ধরিয়ে পিঁড়ির ওপর তা বসিয়ে দেয় সুন্দরী, ঘরের মেঝেয় একটা হোগলা পাত। তাতে জোড়াতালি দেয়া দু'টো কাঁথা ও একটি ময়লা বালিশ। উনুনটা এক কোণায়, তার পাশে দু'তিনটা মাটির পাতিল। ঘরটা ছন দিয়ে ছাওয়া হলেও এখনো বেশ শ্যাছে, অন্তত এবারের জন্য তুফানের ভয় নেই। তাছাড়া দরজার ওপর তেনা দিয়ে মুখ বাঁধা ঘটির ভিতরে যে তাবিজটা আছে তা খুব সজাগ। মহেশপুরের কাসেম খন্দকারের কাছ থেকে আদায় করে এনেছে তাবিজটা। যতদিন তা দরজায় থাকবে কোন বিপদ আসতে পারবে না ঘরে।

পাতিলে ভাত ছিল না। এতরাত্রে উনুন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে প্রবৃত্তি হলো না। হাঁড়িতে চাল আছে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। সুন্দরী বেড়ার কাছে গিয়ে পিতলের গেলাসটায় পানি ভরে পেট ভরে খেলো। একটা রাত পানি খেয়েই কাটিয়ে দেয়া যাবে। রাত্রে তো আর কাজ করতে হয় না। হাঁটতেও হয় না। ঘুমিয়ে পড়তে পারলে খিদের কথা ভুলে যাবে।

নানি, দোর মেলগো। বাতাসী এসে ডাক দেয়।

ঠেলা দে। খোলাই।

বাতাসী ভীষণ ভড়কে গেছে। মুখের দিকে চেয়ে সুন্দরী বুঝে ফেলে ওর মনের অবস্থাটা। থলথলে মুখে হেসে বলে, পাগলি, অত ডরাস ক্যান। আমি তো আছি। কিছু করতে আইলে, এই দেখ।

বালিশের নিচে রাখা দাটা তুলে দেখায় সুন্দরী। বাতাসী জানে, নানির পাঁচসেরি কলজে! তাই সে অবাক হলো না। পিঁড়ির ওপর মোমটা গলে গলে পড়ছিল। মোমের আগুনে এত তেজ যে, আঙুল কাছে নেয়া যায় না। অথচ তার আলো কত স্নিগ্ধ। শাদা আলোয় নানির ভাঁজপড়া মুখটা ভাল লাগছে বাতাসীর। কোঁচকানো রেখাগুলো গোপন স্নেহের প্রকাশে নরম।

দু'জনে শোয়ার পর বাতি নিবিয়ে সুন্দরী বলল, যদি আলাপ পাস আমারে ডাক দিস। কেমুন?

আইচ্ছা। বাতাসী জবাব দেয়।

বাতাসীটা ভারী ভাবপ্রবণ। কোন জিনিশ তার কাছে খারাপ লাগলে অনেক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে সে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে এমনি তার কল্পনাশক্তি।

নানাকথা ভেবে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না তার চোখে, অথচ নানি বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। ওর মগজের ভিতরটা সা সা করতে থাকে। বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না? অনেকক্ষণ কান খাড়া করে রেখে বুঝতে পারলো, এ তার মনের ভুল। কাত হয়ে ওপর কান বাঁ হাতে বন্ধ করে নিজের কানটা বালিশে চেপে রাখে। কোন অনাবশ্যক শব্দও শুনতে চায় না।

কতক্ষণ পর জানে না এক সময় বাতাসী দেখে দুয়ার ভেঙে বিকট চেহারার দুটো লোক ঘরে ঢুকছে। কালো কালো হাত বাড়িয়ে তাকে যেন ধরতে আসছে।

নানি, নানি, বাতাসী চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে জেগে ওঠে সুন্দরী। বলতে থাকে, কিলো, কোন্ হারামজাদি। দেহি, দাওডা বার কর।

মুহূর্তের মধ্যে দা হাতে নিয়ে সুন্দরী এগিয়ে যায় দরজার দিকে। দেখলো দরজা ঠিকই আছে।

খিলটা মজবুত করে আঁটা। বাইরের কারো সাড়া-শব্দ নেই।

বাতাসি বাতি জ্বাল। সুন্দরী জোরে জোরে অদেখা শত্রুর উদ্দেশ্যে বলে, দেহি হতীনের পুত, কই গেছে।

চোখ কচলাতে কচলাতে এত দুঃখেও বাতাসীর হাসি পায়। উঠে বসে বলে, আগো নানি, আমি খোয়াব দেখতাছিলাম।

ও, খোয়াব। আমি ভাবছিলাম সিপাই আইলো বুঝি!

দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল, দুপুর রাত। জ্বলজ্বলে তারাটি ঠিক মাথার মাথার ওপর। চারদিক নিঝ্ঝুম। আসমানে অনন্ত শান্তি বিরাজ করছে। উঠানের চারপাশটা ঘুরে দেখে এসে, বাতাসীকে জড়িয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে সুন্দরী। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকানো শুরু হল।

অনেক রাত্রে শুলেও, ভোররাতে বিছানা ছেড়ে ওঠা তার অভ্যাস। বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচিরমিচির শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীর চোখের পাতা খুলে গেল। রাত পোহায়ে এসেছে! তাহলে আজকে আসেনি সৈন্য?

চোখ কচলিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে এমন সময় দরজায় আঘাত শোনা যায়। কাপড়টা ভালোমতে পেঁচিয়ে পড়ে, দা হাতে নিয়ে দরজার খিল খুলল। তাহলে এসেছে এতক্ষণ?

গ্রামটা ঘেরাও করিয়ে দশ বারটা বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান করছেন বড় দারোগা। সুন্দরীর হাতে অস্ত্র দেখে তাকে জোর করে ধরবার জন্যে পুলিশদের আদেশ দিলেন।

একটা মানুষকে ধরতে এতগুলো লোকের বেশিক্ষণ লাগে না।

তবু অনেক ধস্তাধস্তি হল। উত্তর দিকে বাঁশের দরজাটা ভেঙে তিনজন ঘরে ঢুকে যখন তাকে ধরে ফেলল, তখন একটা পুলিশকে কোপ মেরেছিল সুন্দরী। সে আঘাত লাগেনি। বরং উলটো বেয়নেটের খোঁচা লেগেছে তার হাতে।

তাকে উঠানে ধরে আনলে সুন্দরী দেখল, কেবল দারোগা পুলিশ নয়, আরো অনেক লোক। কয়েকজনকে হাতকড়া লাগিয়েছে। ওকে ধরে সামনে আনতেই ফজর আলি প্রধান বলে উঠল, দেহেন হুজুর। এই বুড়িই সব কিছুর মূল।

সুন্দরী কট্‌মট্‌ করে তাকায় প্রধানের দিকে। তার চোখদুটো ঝাপসা, তবু যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে পুতুলি থেকে। কী বলছে বেঈমান। ও না দাড়ি রেখেছে? সব সময় টুপিমাথায় থাকে? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে? সুন্দরীর থলথলে মুখটা কাঁপতে লাগল।

এই বুড়ি কালহা রাইতে আইয়া গ্রামে খবর দিছে, আইজ সহালে আপনারা আইবেন। তাইনা রাইতে হগলতে পলাইয়া গেছে বাড়িৎ থে। আর যারা বাড়িতে থাকবে, হেরারে কইয়া রাখছে খন্তি দাও কুড়াল ঠিক কইরা রাখতে যাতে আপনেরারে মারুন যায়। আমরার কোন দোষ নাই, হুজুর। হাতজোড় করে ফজর আলি প্রধান বলে, জমিদার আমরার বাপ-মা! আমরা কি তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি? সব নষ্টামির মূলে ঐ বুড়ি।

দারোগাবাবু কিছু বলার আগেই হঠাৎ সুন্দরী খনখনে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, থামলা ক্যান্? অহনোই থামরা ক্যান্ তুমি? কইয়া যাওনা, আরো কইয়া যাও—জমিদাররে শয়তান নায়েবরে কুত্তা ডাকছি, ডাকছি। সব কও, চেঁচাইয়া কও।

এমন সময় আয়নদ্দি শব্দরালি ওরা সাতজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। আগে তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিজের থেকে এদের কাছে আসার মানে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া, এ জানে ফজর আলি প্রধান, তাহলে কেন তারা এল? প্রধান ঠাহর করতে পারেনা কিছুই।

সামনে আসতেই সুন্দরীর চোখ যায় তাদের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ও শিউরে ওঠে। এত মানা সত্ত্বেও কেন এসেছে এখানে বোকার দল? নিজেদের জানের না-হয় ভয় নেই কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চাগুলো? কাচ্চা-বাচ্চাগুলোর অবস্থা কি হবে? ওরা যে না খেয়ে মরবে।

আয়নদ্দি দারোগার কাছে কি বলতে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে তার চোখে এসে পড়ে সুন্দরীর অগ্নিদৃষ্টি। সে বুঝলো এর অর্থ কি। কিন্তু যারা সত্যিকারের নির্দোষ তারা কেন শাস্তি পাবে? তবু আয়নদ্দি কিছু বলতে পারলো না। শুধু একটু নড়ে উঠে থেমে যায় তার ঠোঁটজোড়া।

দারোগাবাবু! কারোর দোষ নাই। এইড্যা হাচা কতা। সবাইরে আপনে ছাইড়া দ্যান্। ভাঁজ-পড়া শান্ত মুখটা তুলে ঠাণ্ডা গলায় সুন্দরী বলল, আগুন আমিই লাগাইছিলাম।

উপস্থিত সকলে চঞ্চল হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। আয়নদ্দি ব্যাকুলভাবে আবার কি বলতে চায়, কিন্তু এবারও থেমে গেল তার শাসন ভরা কঠিন দৃষ্টির সামনে। সবাই দেখল, বুড়ি সুন্দরীর হাত থেকে টপ্‌টপ্ করে মাটিতে পড়ছে লাল রক্ত। দারোগার ইংগিতে পুলিশ হাতকড়াটা এগিয়ে নিয়ে গেল।

জুন, ১৯৪৭

চোখ কচলিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে এমন সময় দরজায় আঘাত শোনা যায়। কাপড়টা ভালোমতে পেঁচিয়ে পড়ে, দা হাতে নিয়ে দরজার খিল খুলল। তাহলে এসেছে এতক্ষণ?

গ্রামটা ঘেরাও করিয়ে দশ বারটা বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান করছেন বড় দারোগা। সুন্দরীর হাতে অস্ত্র দেখে তাকে জোর করে ধরবার জন্যে পুলিশদের আদেশ দিলেন।

একটা মানুষকে ধরতে এতগুলো লোকের বেশিক্ষণ লাগে না।

তবু অনেক ধস্তাধস্তি হল। উত্তর দিকে বাঁশের দরজাটা ভেঙে তিনজন ঘরে ঢুকে যখন তাকে ধরে ফেলল, তখন একটা পুলিশকে কোপ মেরেছিল সুন্দরী। সে আঘাত লাগেনি। বরং উলটো বেয়নেটের খোঁচা লেগেছে তার হাতে।

তাকে উঠানে ধরে আনলে সুন্দরী দেখল, কেবল দারোগা পুলিশ নয়, আরো অনেক লোক। কয়েকজনকে হাতকড়া লাগিয়েছে। ওকে ধরে সামনে আনতেই ফজর আলি প্রধান বলে উঠল, দেহেন হুজুর। এই বুড়িই সব কিছুর মূল।

সুন্দরী কট্‌মট্‌ করে তাকায় প্রধানের দিকে। তার চোখদুটো ঝাপসা, তবু যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে পুতুলি থেকে। কী বলছে বেঈমান। ও না দাড়ি রেখেছে? সব সময় টুপিমাথায় থাকে? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে? সুন্দরীর থলথলে মুখটা কাঁপতে লাগল।

এই বুড়ি কালহা রাইতে আইয়া গ্রামে খবর দিছে, আইজ সহালে আপনারা আইবেন। তাইনা রাইতে হগলতে পলাইয়া গেছে বাড়িৎ থে। আর যারা বাড়িতে থাকবে, হেরারে কইয়া রাখছে খন্তি দাও কুড়াল ঠিক কইরা রাখতে যাতে আপনেরারে মারুন যায়। আমরার কোন দোষ নাই, হুজুর। হাতজোড় করে ফজর আলি প্রধান বলে, জমিদার আমরার বাপ-মা! আমরা কি তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি? সব নষ্টামির মূলে ঐ বুড়ি।

দারোগাবাবু কিছু বলার আগেই হঠাৎ সুন্দরী খনখনে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, থামলা ক্যান্? অহনোই থামরা ক্যান্ তুমি? কইয়া যাওনা, আরো কইয়া যাও—জমিদাররে শয়তান নায়েবরে কুত্তা ডাকছি, ডাকছি। সব কও, চেঁচাইয়া কও।

এমন সময় আয়নদ্দি শব্দরালি ওরা সাতজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। আগে তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিজের থেকে এদের কাছে আসার মানে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া, এ জানে ফজর আলি প্রধান, তাহলে কেন তারা এল? প্রধান ঠাহর করতে পারেনা কিছুই।

সামনে আসতেই সুন্দরীর চোখ যায় তাদের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ও শিউরে ওঠে। এত মানা সত্ত্বেও কেন এসেছে এখানে বোকার দল? নিজেদের জানের না-হয় ভয় নেই কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চাগুলো? কাচ্চা-বাচ্চাগুলোর অবস্থা কি হবে? ওরা যে না খেয়ে মরবে।

আয়নদ্দি দারোগার কাছে কি বলতে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে তার চোখে এসে পড়ে সুন্দরীর অগ্নিদৃষ্টি। সে বুঝলো এর অর্থ কি। কিন্তু যারা সত্যিকারের নির্দোষ তারা কেন শাস্তি পাবে? তবু আয়নদ্দি কিছু বলতে পারলো না। শুধু একটু নড়ে উঠে থেমে যায় তার ঠোঁটজোড়া।

দারোগাবাবু! কারোর দোষ নাই। এইড্যা হাচা কতা। সবাইরে আপনে ছাইড়া দ্যান্। ভাঁজ-পড়া শান্ত মুখটা তুলে ঠাণ্ডা গলায় সুন্দরী বলল, আগুন আমিই লাগাইছিলাম।

উপস্থিত সকলে চঞ্চল হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। আয়নদ্দি ব্যাকুলভাবে আবার কি বলতে চায়, কিন্তু এবারও থেমে গেল তার শাসন ভরা কঠিন দৃষ্টির সামনে। সবাই দেখল, বুড়ি সুন্দরীর হাত থেকে টপ্‌টপ্ করে মাটিতে পড়ছে লাল রক্ত। দারোগার ইংগিতে পুলিশ হাতকড়াটা এগিয়ে নিয়ে গেল।

জুন, ১৯৪৭



কাঠের নকশা

আচমকা দরোজা খুলে বারান্দায় পা দিয়েই হিহি করে হাসতে থাকে মেয়েটা, চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে গরিমার রং। সুঠাম শরীর আর বেশভূষায় দেখতে আমার চেয়ে ঢ্যাঙা; কিন্তু এতে কী আসে যায়, আগেকার দিন থাকলে দেখিয়ে দিতাম মজা। চুল ছিঁড়ে আঁচড়িয়ে, খামচিয়ে। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি?

কিন্তু সেই দিন আর নেই। মনের ভাবটা চেপে রেখে বললাম, পথ ছাড়। তোমার বাবার সঙ্গে একটা কাজ আছে। জরুরি কাজ।

আমার গলার ঝাঁজে রিজি হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। কি বলবে তা ঠিক করতে না পেরে ম্লানমুখে বাঁধন খুলে দিয়ে আবার বাঁধতে থাকে খোঁপা। এতদিনে অনেক বড় হয়েছে চুল, কাজল ঐশ্বর্যে ছড়িয়ে পড়েছে কোমর ছাড়িয়ে। সাপটানো চেলীতে সুগন্ধি তেলের নিবিড়তা। বার বছরের মেয়ে দশহাতি শাড়িটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে পরায় চেহারায় বেশ একটা পাকামোর আদল ফুটে উঠেছে। নতুন রুপোর হার চক্‌চক্‌ করছে গলায়, হাতে চিকন কারুকাজের চুড়িগাছি। আমার পরনের ময়লা লুঙিটার দিকে নজর পড়তেই ওর সাথে আমার ফারাকটা সহজেই বুঝতে পারি।

একটু বসো। বাবা ভাত খাচ্ছেন। কথাটা বলে রিজিয়া আবার চলে গেল ঘরের ভিতরে। আমার মেজাজটা তাহলে ওর মনে লেগেছে।

পরিবর্তনটা খুব বড় করেই চোখে পড়ে। যদিও সাতশ তিরিশ দিনেই দু'বছর, তবু মনে হয় রাতারাতিই যেন হয়ে গেল ব্যাপারটা। কে দেখেনি রাজমিস্ত্রী জোগানদার দলের মজুর রহমানকে, বয়স তিরিশের সীমানায়, বেঢপ চেহারায় দুষ্টবুদ্ধির ছাপ। রোজকার রুজিতে ভরপেট খেতে পেত না সবদিন। জবুথবু গুমটি মেরে-থাকা ছনের ডেরা বাঁশ ঝাড়ের নিচে, বৈশাখের তুফান কতবার চাল উড়িয়ে নিয়েছে। সেদিন পর্যন্ত পাটের দালাল মনু ব্যাপারীর মত লোক সামান্য কারণে ওর গালে চড় কষতে ইতস্তত করেনি, বিচারের কথা তুললে হাসতে হাসতে দেখিয়েছে বুড়ো আঙুল।

কিন্তু এখন কপাল ফিরেছে, যেখানে ছিল নবড়বেড় কুঁড়েঘর, আজ সেখানে একতালা পাকাবাড়ি, আর কত মনু ব্যাপারী এখন তার কথায় ওঠে বসে। জুগালি রহমান আজ এ অঞ্চলের রহমান ওস্তাগার।

বসে চেয়ে দেখছি, জামরুল গাছটা নেই। যতদূর মনে পড়ে, দালানের উত্তর কোণটাতেই ছিল। আমার স্মৃতির পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে কৈশোরের সেই দিনগুলো, চোখের সামনে দিয়ে একে একে ভেসে যায় সে-ছবি রহস্যময় চঞ্চলতায়। ঘন সবুজিমার ছোঁয়া-লাগা ধানচারার মত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়েছি কেবল পৃথিবীর আলো হাওয়ায় ; সেই গৌরীপুরের কারখানা, মিস্ত্রিদের বস্তি, মটরক্ষেত মাড়িয়ে পথ খাটো করে নেয়া, ডাকবাংলোর হরিণ, শাদাসাহেবের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া, পিতলের চাকতির জন্য এক মাড়োয়ারীর ব্যাটার সঙ্গে খাতির জমানো, লাল ইটের থামে বসে ডুবুরির অমানুষিক সাহস দেখে আশ্চর্য হওয়া, কামরাঙা খাওয়ানোর বাজি রেখে গোনা মেঘনার ঢেউ। সমস্ত অঞ্চল

দিনরাত সরগরম, যেন একটা জীবন্ত চাকায় ঘুরছে মানুষগুলো, বাদাম ফেরিওলা থেকে শুরু করে বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পর্যন্ত। এক বছরের মধ্যে গড়ে শেষ করতে হবে বেশ প্রসারিত মেঘনার সেতু।

বড় বড় থাম গাঁথা হচ্ছে ইটের পর ইট সাজিয়ে।

বাবা বাঙালী রাজমিস্ত্রিদের একটি দলের সর্দার। এ দলটির নামডাক কেবল প্রথম শ্রেণীর কারিগর নিয়ে গঠিত বলে নয়, তাদের গা-গতরও বেশ শক্তসমর্থ। তবু জোয়ান বিদেশী মিস্ত্রীদের কেউ কেউ বাঙালীদের নিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় পরিহাস করতে ছাড়েনি। কিন্তু বাবাকে খাতির করত সবাই ; তার দীর্ঘ ও শক্তিশালী শারীরিক গঠন আর সহজ সরল খোশমেজাজে অনেকে রসিকতা করে ডাকত দোস্ত। কিছুদিন পর আমারও দোস্ত জুটে গেল একজন। একদিন বিরাট দাড়িওয়ালা একটা লোক আমার কাঁধে হাত রেখে জিগগেস করলে, ইয়ে কোন্ হ্যায়?

বাবা হেসে জবাব দিলেন, আল্লাকা মাল, ব্যাটা।

তব্ তো মেরা দোস্ত? ঠিক হ্যায়।

লোকটা সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়ে আমার মাথায় হাত বুলাল, চিবুক ধরে মুখটা দেখল অনেকক্ষণ। আমি চেয়ে দেখলাম ওর আলখাল্লার ভিতরে আমার মত কয়েকগণ্ডা ছেলেকে পুরে রাখা যায় অনায়াসে; কালো দাড়ির গুচ্ছ বুক ছাড়িয়ে নাভির কাছাকাছি এসে ঠেকেছে। পিটপিটে চোখ, নাকটা পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে আবার একটু বেঁকে গেছে নিচের দিকে, তার ছিদ্র যেন একজোড়া বেজীর গর্ত।

সেদিন কী বার ছিল মনে নেই। শরতের ঝরঝরে নীল আকাশ হরেকরকম মেশিনের চোঙের ধোঁয়ায় ঝাপসা, মেঘনার ওপারে লালপুরের চরটা রুপালি বালুতে চিক্‌চিক্ করছে, আর নদীর বুক থেকে বয়ে এসে গা জুড়িয়ে দিচ্ছে ফুরফুরে হাওয়া। হোটেলে বাবার টিফিন ক্যারিয়ারটা রেখেই বেরিয়ে গেলাম বাইরে। ঘুরে বেড়ানোর অনুমতির জন্য বাবার কাছে যেতেই দেখি সেই পাঞ্জাবী আর নতুন একটা লোক নিচে দাঁড়িয়ে আছে। কার্নিশের মাপ সেরে, ইট বসানোর কায়দাটা মিস্ত্রিদের দেখিয়ে দিয়ে বাবা নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। দু এক ধাপ ওপরে থাকতেই দোস্ত বলতে লাগল, সোন লো ওস্তাদ, ইয়ে আদমি বোলতা হ্যায়—

আরে রহমান যে। কি খবর? পাঞ্জাবী তোরে পাকড়াও করল কোত্থেকে?

ইয়ে আদমি নোকরী চাহতা থা!

রহমান উস্‌খুস করে বলল, কোন কামকাজ পাইনা, সংসার চালাই কেমনে? ভাবলাম, তোমার কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি।

আগে তুই কি করতি? কি কাজ?

গেরস্ত বাড়িতে মুনি খাটতাম। এখন আর রাখতে চায় না। গতকাল টইটই করে ঘুরলাম সারাদিন, কামলা খাটবার কথা শুনে কিষাণরা রেগেমেগে টঙ। বলে, নিজেদের মেহনতের পয়সারই কোন হদিশ নাই, আবার উনি এসেছেন কামলা খাটতে। বাইরে কাজ দেখনা বাপু? মজুরি করনা গিয়ে মেঘনার পুলে? যা, যা।

রহমান থামল। চেহারায় ফুটে উঠল ধূসর কাঠিন্য। বাবা ওর আপাদমস্তক চেয়ে দেখলেন কয়েকবার, যেমনভাবে পর্যবেক্ষণ করেন লাল ইট আর গাঁথনির মশলা, ফিতে

দিয়ে মেপে পাকা জায়গায় দাগ কাটেন আর ছোট্ট কর্নির সাবধানতায় আঁকেন সমতল নকশা। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে আয়।

তাকে নিয়ে ভাত খেতে বসলেন হোটেলের এককোণে। অনেক কথার পর আমাকে বললেন, একে তুই কাকা বলে ডাকবি, বুঝলি?

ঘাড় নেড়ে জানালাম যে বুঝেছি। কিন্তু কিভাবে ডাকব? জানা নেই, শোনা নেই, লজ্জায় জিভ জড়িয়ে আসবে না? বেশ কয়েকদিন এই ভাবনায় তোলপাড় করেছে আমার মন, শিরায় শিরায় কে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে সংকোচের।

রহমান কাকা বলে পিছন থেকে কতদিন ডাক দিতে চেয়েছি, কিন্তু গলায় স্বর গিয়েছে আটকে।

এরপর আমাকে নিয়ে গেল একদিন। এত কাছাকাছি, তা আগে জানলে অপরিচয়ের অনুভূতিটা এমন লাগত না। পাশের গ্রামেই তার বাড়ি। বিশেষত আমি যে-পথ দিয়ে রোজ ভাত নিয়ে যাই, তার উত্তরদিকে তেরছা পথ ধরে সুপারিবন পেরুলেই দেখা যায়। ঘরটা ছনের হলেও বেশ গোছানো ; এটেল মাটিতে লেপা শুকনো বারান্দাটা তক্‌তক্‌ করছে, তার উপরে সাজানো পিঁড়ি আর একটা চলচৌকি। উঠানে পা দিয়েই রহমান কাকা ভীষণ ডাকাডাকি শুরু করে দিল, কই গো, জলদি আয়।

কি বাজান বলে গাছের নিচ থেকে দৌড়ে এল চটপটে মেয়েটা, কাঁচা জামরুল চিবোচ্ছে এলোপাথাড়ি, আরও গণ্ডাখানেক মুঠোয় ধরা। গায়ের রং শ্যামল, গলায় নীলসুতোয় গাঁথা পুতির মালা। মুখে লাবণ্যের ছাপ, চাঞ্চল্যে যা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বারবার।

দ্যাখ্‌ কে এসেছে।

কে। রিজি বোকার মত চেয়ে আমায় দেখতে লাগল।

কাকা হেসে বলল, তোর ভাইরে, তোর নতুন ভাই। তোরা দু'জনে একত্রে ভাত নিয়ে যাবি, বুঝলি? ওর বাবা আমাদের ওস্তাদ। একসঙ্গে কাজ করি আমরা।

সুযোগ পেলেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করে অপরিপক্ক মেয়েটাকে কিছুদিনের মধ্যেই এমন ভক্ত করে নিলাম, ঘুমোতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার সময়টুকু ছাড়া এক মুহূর্তও কেউ একা থাকতে পারতাম না। এই একই ছন্দে সময়ের চাকা গড়িয়ে গেল।

তখন শীতের দিন। দুপুরেও কুয়াশা ঝুলে থাকে মাঠের উপর। রহমান কাকা আমাদের বাড়ি আসত রাত্রিবেলা, গায়ে মোটা একটা কাঁথা জড়িয়ে, অনেক সময় শখের নারকোল ডাবাটা সঙ্গে আনতেও ভুল করেনা। দু'জনে মিলে আলাপ চলত অনেক রাত অবধি, সামনে আগুনের কড়াই, সুগন্ধি মশলাতামাক আর লম্বা নলওয়ালা গুড়গুড়ি। কোন্‌ জুগালি বিড়ি খাওয়া ও নামাজ পড়ার ছুতোয় কাজ ফাঁকি দিয়েছে, কোন্‌ মিস্ত্রি এখনও কর্নি ধরতেও শেখেনি, ঘাড়টা কাত করে একের পর এক বলে যায় রহমান কাকা, আর বাবা বসে বসে গুড়গুড়ি টানেন নিবিষ্ট মনে। একেকবার বিশ্রী হয়ে ওঠে তার কণ্ঠস্বর, অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে দাঁত খিচায়। বাবা নির্বিকার, নিরুত্তাপ, ভেড়ার লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকেন কাদার মূর্তির মত, কুপির আলো ছড়িয়ে পড়ে তার রেখায়িত কপালে, কম্বলের ভাঁজে ভাঁজে। রাত বেড়েই চলে। বাইরে টুপ্‌টাপ্‌ শিশির ঝরে। কাঁথার ভিতরে শুয়ে থাকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে আসে আমার চোখের পাতা, আধ-ঘুমেও রহমান কাকার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

কুয়াশার আড়ালে কখন সূর্য ওঠে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু বাবার ঘুম ভাঙার সময়ের এতটুকু নড়চড় হবার জো নেই। রাত কিছু থাকতেই তিনি উঠে পড়েন বিছানা ছেড়ে, দেশলাই কাঠি জ্বেলে বাতি ধরান সাবধানে, বড় কলকেয় বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে এক ছিলিম তামাক সাজেন, টানতে টানতে ঘুমের ঘোরটা কাটিয়ে দিয়ে চাঙা হয়ে ওঠেন বিছানায়।

মা জাগেন। কাঁথার ভিতর থেকে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে টের পাই।

আগুন তুলে আন। উঃ যা ঠাণ্ডা। কানে বাজে বাবার কণ্ঠস্বর।

মা বলেন, যাই।

ভাত খাওয়াও মুশকিল। পানি না যেন বরফ।

গরম পানি করছি। মা জবাব দেন সংক্ষেপে উঠতে উঠতে।

এমনি ধরনের টুংটাং কথা হয়। মাথায় কানটুপি, গায়ে নিলামের মোটা কোট, পায়ে ক্যানভাসের জুতো—বাবা খেয়েই বেরিয়ে পড়েন বাইরে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় থপ্‌থপ্ পায়ের আওয়াজ।

দু'মাসের মধ্যেই জোগানদারের বেলচা ছেড়ে মিস্ত্রির কর্নি ধরল রহমান কাকা। একদিন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে উঠল, চেষ্টা করলে গিরগিটিও কুমির হতে পারে, কি বলো?

হুঁ! বাবা নাক দিয়ে একটা শব্দ করেন।

জীবনে উন্নতি করতে চাইলে অপরের প্রতি এত দরদ থাকলে চলে না। রহমান কাকা বলেই চলল, দেখেছি টাকা না থাকলে ফেরেশতার মত লোককেও কেউ ঠ্যাং দিয়েও পুছে না। আর পকেটটা একটু ভারি হলে সবাই এসে নমো নমো করে। কাজেই দুনিয়াতে নিজের স্বার্থ দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

গালে হাত দিয়ে কি ভাবছো?

কে? ও রিজি। আমি এক স্বপ্নের জগৎ থেকে যেন নেমে এলাম অকস্মাৎ। বললাম, রহমান কাকা এখনো এলেন না? উঃ, কতক্ষণ বসে আছি। ওদিকে মা'র সাংঘাতিক অসুখ।

রিজি বলল, চল।

কোথায় যাবো? জিগগেস করলাম।

বাবা ভিতরে যেতে বলেছেন। খেয়ে দেয়ে আরাম করছেন কি না?

পাকা বারান্দার দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে যে-কোঠায় ঢোকা গেল তার একপাশে লতা-কাটা ও রং করা নতুন কাঠের পালঙ্ক, বিপরীত দিকে একটা বড় আয়না। আলমারির ভিতর সুন্দর ফুলদানি, কয়েকটা এলুমিনিয়ামের ডেকচি, চিনির বোয়াম, আরো অনেক জিনিশ, যা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। নরম বিছানায় মোটা বালিশে গা এলিয়ে পান চিবোচ্ছে রহমান ওস্তাগার। পাশে বসে আছে তার বৌ, সোহাগে পানের রস ঝরছে ঠোঁট বেয়ে, পিক্‌পিক্ হাসছে। ঘরে ঢুকতেই চোখজোড়া ছোট করে বলে উঠল, কিহে বাপু, খবর কি? টাকা পয়সার ব্যাপার নাকি? তা তোমাদের তো এ জিনিশটার দরকারই পড়ে না। কেমন কিনা, হেঃ হেঃ হেঃ।

কথাগুলো ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্যে ভরা। বিশেষ করে এ-কথার পিছনে যে-খোঁচা, তাই জ্বালাময়। ইতস্তত করে বললাম, তুমি যে বলেছিলে সেদিন—

কি? ফরসিহুঁকোর নলটা টেনে নেয় মুখের কাছে।

বাবার নকশাগুলো—কি বলবো, থমকে গেলাম।

কিনতে চাই, এইতো? মাথা দুলিয়ে আমার কথাটা টেনে শেষ করল।

হ্যাঁ! আমি মুখ নিচু করে বললাম, এখন খুব অসুবিধা কিনা—

ও বুঝলাম। এখন বুঝি আর চলে না? কাপড় আর চেহারা দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে বেশ। কিন্তু বলি বাপু, ঐদিন তোর মা খুব ফকর করেছিল যে নকশাগুলো বেচবে না। আহা, কি কথা, যেন জমিদারনী। পানের বোঁটা থেকে চুন মুখে দিয়ে আবার শুরু করল, দ্যাখ, জীবনে অনেক চাঁদের ব্যাটাগিরিই দেখেছি—থাকে না বেশিদিন। ঐদিন কত অনুরোধ করলাম, পাঁচ টাকার জায়গায় দশ টাকা দেব, দিয়ে দাও নকশাগুলো। এ ত আর কোন কাজে লাগবে না, ঘরে থেকেই পচবে।

আমি বলতে চাইছিলাম—বাধা দিলাম।

তিরিক্ষি মেজাজে উচ্চারণ করল, কি, জলদি ক।

বললাম, নকশাগুলো বেচে দেব তুমি যদি—

দ্যাখ্, কথায় বলে, গাধা পানি খায়, তবে ঘোলা করে খায়। তোর বাবা মিস্ত্রিদের জন্য জেলে গেল, এক পয়সা দিলনা মিস্ত্রিরা। আমি জানতাম তোর মা'র লাফানি থাকবে না বেশিদিন। বেচতেই হবে ওগুলো হেঃ হেঃ হেঃ। হাসির তোড়ে ভুঁড়িটা নাচতে থাকে তার।

আমি বললাম, তুমি যদি কেন, তাহলে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

তার মানে? একটু চমকে উঠে প্রশ্ন করল, কোথায়?

আমাদের বাড়িতে। আমি বললাম।

এবার সত্যই আঁৎকে উঠল, বলতে লাগল, ওরে বাব্বা। তা আমি পারব না, বাপু, তোর মা যা তেজ দেখায়, নকশাগুলো যেন বাদশাহি আর কি!

তার অসুখ। আমি বললাম, উঠতে পারে না।

তা'হলে বেশ। একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে চল্—

ইতোমধ্যে রাজমিস্ত্রিদের আর একদল এসে হাজির। এখনো থামেনি মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন। সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে রহমান ওস্তাগার। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার গোপন যোগসাজশের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। ওরা চোখ রাঙাল, ঠাটানি দিল। ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে দেরি হয়ে গেল।

আমি ভাবছিলাম, নকশাগুলো বেচে দিয়ে টাকাটা পেলেই হয়। তক্ষুণি ছুটতে হবে আরঙে। ঘরে একমুঠো চাল নেই, গতকাল সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত কিছুই পেটে পড়েনি। দাদি বোধ হয় গালাগালি শুরু করে দিয়েছে, না হয় খিদেয় প্যান্‌প্যান্ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ের জন্য ওষুধ না আনলেও চলবে না, রোগটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সরকারি ডাক্তারখানা থেকে যা ওষুধ দেয় কেবল রঙিন পানি, কোনই কাজ হয় না। ওরা ভালো ওষুধ থাকলেও দেয় না, কিন্তু বাঁ হাতে কিছু গুঁজে দিতে পারলে নতুন নতুন পুলিন্দা যে কোত্থেকে আসে তা রহস্য। বন্দরের সেরা ডাক্তারের কাছে ভালো ওষুধ আছে, কিন্তু দামের কথা শুনলে মাথার চুল পড়ে। তবু সবকিছু করব মা'কে বাঁচাবার জন্য।

কিছুক্ষণেই আমরা দু'জনে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নকশা হুঁ হুঁ—একবার আপন মনেই হেসে উঠল রহমান ওস্তাগার।

এক বছর আগের কথা। একটানা সারাদিন কাজ করে এসেও বাবার এতটুকু শ্রান্তি নেই। এর আগে পুরো দেড়টি মাস বাইরে ঘুরেছেন একা একা, হাতে মোটা বেতের লাঠি

আর কাঁধে বোচকা। এত নামও জানিনে—কোথায় গৌড় , কোথায় পাণ্ডুয়া, কোথায় মুর্শিদাবাদ। সেসব স্থানে নাকি অতীত যুগের কত দালান-কোঠা, মন্দির-মসজিদ, স্তম্ভমিনার। সানবাঁধানো ঘাট, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ। এগুলোর অধিকাংশ যদিও ভেঙে গেছে, বসে গেছে মাটির স্তূপে, তবু এসব অতীতের গৌরবময় স্থাপত্যচিহ্ন। বাবা ঘুরেছেন, এসব দেখেছেন। পরীক্ষা করেছেন। স্থাপত্যে নতুন সৃষ্টি চাই ; কিন্তু ঘরে বসে কর্নি ঘুরালেই আসবে না সে-হাত। অনেক কিছু দেখতে হবে। বুঝতে হবে। খাটতে হবে দিনরাত। বাবা'কে কতবার আফসোস করতে শুনেছি। আহা যদি আগ্রা যেতে পারতাম, তাহলে দেখতে পারতাম কেমন যাদুকরী শক্তি ছিল তাজমহলের মিস্ত্রিদের হাতে।

একেক দিন অনেক রাত হয়ে পড়ত। আমার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। কুপি টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে। বাইরের এঁদোবনে মালপোকার একটানা আওয়াজ উঠছে, কানে তালি লাগে। পালিশ করা কাঠ, হাতুড়ি আর ছোটবড় হরেকরকম বাটালি নিয়ে বাবা খুটখাট করছেন একমনে। পাশে বসে মা তামাক সেজে দেন। দু'জনই চুপ। একটা কথা বললেই যেন সব পণ্ড হয়ে যাবে, চুরমার হয়ে যাবে অনেকদিনের স্বপ্ন, এমনি একটা ভাব। তবু মাঝে মাঝে দু'একটা কথা না হত এমন নয়। একরাত্রে মা বললেন, কি হবে রাত জেগে জেগে অমন নকশা করে? এমনিতেই তো বেশ কাজ হয়, পরের দালান আরো সুন্দর করে লাভ কি? বাড়তি মজুরি ভ আর দেবে না?

শব্দগুলো কানে বাজতেই বাবা চোখ তুলে চাইলেন, যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। তার পর হৃদয়ঙ্গম করে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আশ্চর্য! তোমার মুখে এই কথা!

কেন, আমি খারাপ বলেছি কিছু?

খারাপ কিছু নয়! হাতুড়িটা মাটিতে রেখে বাবা বলতে লাগলেন, তবু এমন কথা তোমার মুখ থেকে আশা করিনি। দালান যারই হোক, আমার কাজ আমি করব না? আমার মন যা চায় তা করব না আমি? সেই দালানের বারান্দায়ও হয়ত বসতে দেবে না। তবু আমার কাজ ত থাকবে, আমার কাজ?

একটু থেমে মা বললেন, তা জানে। তবে পয়সার দিকটাও দেখতে হয়।

বাবা একটা হুঁ করে হাতুড়িটা তুলে নিলেন।

আবার রাত হয়। অনেক রাত। কত রাত?

ওদের হাসাহাসিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ কচলিয়ে চাই কুত্‌কুত্‌ করে, বাতি জ্বলছে। বাবা মার হাত ধরে টানাটানি করেন, দেখি না—দেখি, কি এঁকেছ?

না না! দেখাব না। কিছুই হয় নাই।

না হোক। তুব আমি দেখব!

কাঠের টুকরোটা বাবার হাতে ছেড়ে দিয়ে মা বলেন, আমি তো আর মিস্ত্রি নই, নকশাদারও নই। মনে যা এল তাই আঁকলাম।

বাবা গম্ভীর হয়ে নেড়েচেড়ে দেখেন কাঠের নকশাটা, তারপর একটু জোরেই হেসে ওঠেন, না, তোমার কোন আশা নাই, সত্যি, কিছছু হয়নি!

না হোক, নাই। কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে মা বলেন, আমি কাউকে গায়ে পড়ে দেখতে বলেছি নাকি? দাও দিকিন আমার জিনিশ।

না দেবো না। বাবা ছেলেমানুষী করেন মৃদু হাসতে হাসতে।

না দিলে জোর করে নেব। রিনিঠিনি রেশমী চুড়ির হাত বাড়িয়ে না বলেন, আমি অত অবলা নই।

বাবা পাল্লা দিতে চান, বললেন, নাও ত দেখি মিস্ত্রিগিন্নীর কত জোর!

কাঠের নকশাটা দেখতে দেখতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়, আলোর সামনে তার চেহারায় ফোটে এক গভীর ঔজ্জ্বল্য। মুগ্ধকণ্ঠে বাবা বলে ওঠেন, কী সুন্দর! একেবারে নিখুঁত হয়েছে।

থাক্। মা কৃত্রিম অভিমানের ভঙ্গিতে বলেন, আর ইয়ার্কি লাগবে না।

আমার এ ইয়ার্কি যেন সত্য হয়। আত্মস্থ হয়ে বাবা বলতে থাকেন, জানিনা এসবের সমাদর হবে কখন। একথা ঠিক, এমন একদিন আসবে যখন মানুষ এগুলা খুঁজবে। কিন্তু তখন হয়ত আমরা থাকব না!

মা নিম্নস্বরে উচ্চারণ করেন, ঠিক!

আরো অনেক রাত হয়। অনেক রাত। কত রাত?

এরপর একদিন বাবা বাড়ি আসনে অনেক রাত করে,সঙ্গে আসে মিস্ত্রিদের আরো কয়েকজন। কি যেন আলোচনা করে তারা, গরম হয়ে ওঠে। গুড়গুড়ি টানতে টানতে বাবা কথা শুনে যান একমনে, পাতলা ধোঁয়ার আড়ালে তার চোখও জ্বলতে তাকে অঙ্গারের মত।

মাথায় কাপড় দিয়ে মা এস বলেন, নকশাগুলোর কাজ শেষ করতে হবে না?

এখন সময় নাই। বাবার জবাবটা বেশ গম্ভীর, কি যেন ভাবছেন।

হয়েছে কি শুনি? মা'র মুখে উৎকণ্ঠা।

অসম্ভবব ব্যবস্ততায় বাবা বলেন, রাখ, সবই বলব, সবই শুনতে পাবে।

অনেকেই শুনল। একদিন দেখা গেল মস্ত গুদামঅঞ্চল নীরব, নিস্তব্ধ। একটা কাকও নেই, কাজ বন্ধ, মিছিল হবে বিকেলবেলায়। আমতলাতে কিষাণ, জুগালী ও মিস্ত্রিরা এসে জুটেছে। এদের অনেককে দেখেছি একই জায়গায় কাজ করতে, কিন্তু এমন কিছু আগে আমার চোখে পড়েনি কোনদিন। দেখলাম, ঝাপসা চোখেও রয়েছে সংকল্পের জ্যোতি, হাড়সার বুকেও মুক্তির আন্দোলন, ভাঙা কণ্ঠেও জীবনের নির্ভীক ঘোষণা। বিস্মিত চোখ মেলে মিশে গেলাম জনতার মাঝে, আর এক গভীর আত্মবিশ্বাসের গৌরবে আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মিছিল বন্দরের রাস্তায় ঢোকার আগেই লালপাগড়ি এল। গুন্ডারা ভেতর থেকে গন্ডগোল বাঁধিয়ে দিল।বাবাকেই গ্রেপ্তার করা হল সর্বপ্রথম। দারোগার কাছে দাঁড়িয়ে রহমান বলতে লাগল, আমি আগে বলিনি এসব ভালো নয়? আজকের দিনে এক টাকা মজুরি দেয় কে? তবু ত তোমরা শুনলে না! এসব ওপরওলার ব্যাপার, বুঝেশুনে কাজ করতে হয় হে! দুনিয়াটা পাগলামোর জায়গা নয়।

এতক্ষণে আমরা ছাড়িয়ে এসেছি মাঠের পথ। আমার ওপর সূর্য কিছুটা হেলে পড়েছে। দ্রুতপদে যখন উঠানে এসে পড়লাম তখন ঘরর ছায়া কার্নিশ ছাড়িয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে ইস্! এদিকে আমার অনুপস্থিতিতে কি হয়েছে কে জানে, মা'র জ্বরটা বাড়েনি ত আবার? এখন ঘুমিয়ে থাকলে নির্বিবাদে আমার কার্যোদ্ধার হয়ে যায়।

বললাম, একটু দাঁড়াও। আমি দেখে আসি!

জলদি কর্, জলদি কর্। ফিস্‌ফিস্ করে বলল ওস্তাগার।

দরোজা ভেজানো ছিল, খুলে ফেললাম সাবধানে। মা সটান পড়ে রয়েছেন চৌকিতে চোখেমুখে কাঁথা। শিয়রে পানির কলসী আর মাটির গেলাস যেভাবে রেখে গিযেছিলাম তার একটুক নড়চড় হয়নি। ঘরের থমথমে নীরবতায় একটা অহেতুক আশঙ্কা আমার অনুভূতির সীমায় কুন্ডলী পাকিযে উঠল, সামনে এগতে গিয়ে পা জড়িয়ে গেল।

এদিকে এসো! নিচুস্বরে ডাকলাম।

জলদি কর্। জলদি কর্ ব্যাটা।

না, আর একটুও দেরি নয়। চোখ বুজে মাথা গলিয়ে দিলাম পাশের কুঠরিতে। সবাইকে গোপন করে আমি যেন এমন কিছু চুরি করতে এসেছি যা অমূল্য। ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে বুকের ভিতরটা আর পা কাঁপছে শিরশির ক'রে। তবু পিছিয়ে গেলে চলবে না। যেমন করেই হোক কাঠের বাক্স থেকে বার করতে হবে নকশাগুলো, হ্যাঁ যেমন করেই হোক।

হাত লাগালাম বাক্সের ডালায়।

মনে হল, একটা ভারী জিনিশ ওপরে তুলছি। হঠাৎ হাত কেঁপে গেল। আর পরক্ষণেই একটা ভীষণ শব্দ।

কি হলরে? ডালাটা ফেলে দিলি যে!

ও তাইত! পড়ে গেল যে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকি আমি।

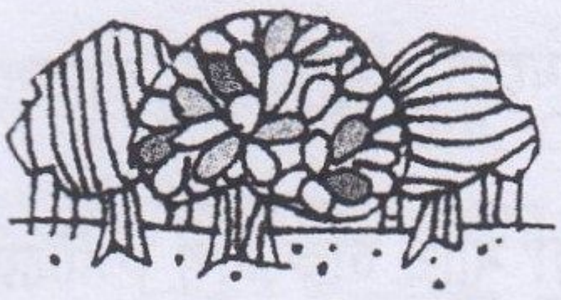
কে রে ও কোঠায়? ধড়্‌মড়্ করে উঠে মা টলতে টলতে দৌড়ে এলেন। ওস্তাগার সরে পড়ার উদ্যোগ করছিল, কিন্তু তখন আর সময় নেই। মা'কে দেখতে পেয়ে আপনা থেকেই বলতে লাগল, দ্যাখ আমার কোন দোষ নাই। তোমার ছেলেই আমার কাছে কেঁদেকেটে পড়েছে, ঘরে নাকি চাল নাই, ওষুধ নাই!

নিমেষে ব্যাপারটা মা'র কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ভিতরের দোর ছাড়িয়ে এসে তিনি আগলে দাঁড়ালেন নকশার বাক্সটা, তাঁর চোখ থেকে তখন আগুনের ফুলকি ঝরছে, থমকে যাওয়া অগ্নিগিরির মত তার মুখমণ্ডল। ভয় পেয়ে সে নেমে গেল উঠানে, কাঁচুমাচু করে তোয়াজের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, আচ্ছা, তুমিই বল ত, এসব নকশা দিয়ে আর কি হবে? তোমাদের কোন কাজে আসবে কি? বেচে ফেললে ক'টাদিন চলতে পার। তাছাড়া টাকাও ত কম দিচ্ছি না? আরেকবার ভেবে দ্যাখ বড় ভাউজ।

প্রথমত মা কোন জবাব দিলেন না; এরপর তাঁর মুখের রং বদলে গেল। ধীরে ধীরে, দৃঢ়তার সঙ্গে ফুটে উঠল এক অপূর্ব প্রশান্তি। তিনি শান্তস্বরে বললেন, কিছু না হোক, কোন কাজেই না আসুক, তবু এগুলো আমারই কাছে থাকবে, আমারই কাছে থাকবে।

কেন জানিনা, আমি তখন স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়িয়েছিলাম, এবং কাঁদছিলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

জুলাই, ১৯৪৭।



কয়লা কুড়ানো দল

এখন, রাত শেষ হয়ে আসছে। গাছে গাছে পাখির ডানাঝাড়া ও মৃদু কলকাকলি। এ সময়টায় অনেকেই ঘুমোয় আরাম করে একটু গা এলিয়ে। কিন্তু ইস্টিশনে মালগাড়ির ইঞ্জিনটা পনেরো কুড়ি মিনিট এমন গোল করতে থাকে যে, অতি আয়েশীরও না জেগে উপায় থাকে না। কয়লা কুড়ানো ছেলেদের কাছ থেকে এর অন্য রকম মানে শোনা যায়। ওরা বলে, সারারাত ভারি ওয়াগনের বহর টেনে ইঞ্জিনটা বেজায় কাহিল হয়ে পড়ে, তাই খিদের জ্বালায় এমন তর্জন গর্জন। পেট ভরে পানি খাইয়ে ছেড়ে দিলেই আবার চলতে থাকবে খচর্ খচর্ জবরজং আওয়াজ তুলে।

এ ব্যাপারে পদ্মমাসির মনোভাবটা কি জানা যায়নি। তবে একথা ঠিক, তার ঘুম ভাঙার জন্যে কোনরকম গোলমালের দরকার হয় না। দূর থেকে গাড়ির চাকার শব্দ শুনলেই চট করে চোখের পাতা খুলে যায় তার আর তখনই একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসে বিছানার ওপর। আসলে, এ সময়ের টানটা তার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। কোন কারণে গাড়ি না এলেও এ সময়ে ঠিক এমনিভাবে ঘুম ভাঙবে তার। শরীরের কাপড় ঠিক করে আচ্ছন্নের মতো উঠে গিয়ে খিলটা খুলবে দরোজার, বাইরে বেরিয়ে বটগাছের ফাঁকে ঘাড় উঁচু করে দেখবে পুব দিকটা এখন ফর্সা হয়েছে কিনা, এবং শুকতারাটা কোথায়। এরপর, ঘরে গিয়ে মালসায় ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালাবে আগুন এবং কেরোসিন কুপিটা তুলে নেবে তাড়াতাড়ি।

অন্যদিনের মতো আজও তাই হল। আলোটা জলচৌকির ওপর রেখে পদ্মমাসি ঘরের এক কোণায় মাচানে রাখা হাঁড়ি পাতিলের কাছে যায়, কাঁসার থালাটা ধুয়ে তার মধ্যে চিপে চিপে রাখে পান্তাভাত।

সব ঠিকঠাক করার পর আসল কাজ। তা হল, মনুকে ঘুম থেকে জাগানো, খাওয়ানো ; এরপর পাঠানো বাইরে। মুখে বলে ফেলা সহজ, কিন্তু এ করতে রীতিমতো মগজ খাটাতে হয়। কোঁকড়ানো বালিশটা আঁকড়ে ধরে ও ঘুমোচ্ছিল উপুড় হয়ে, পদ্মমাসি মুখ দুয়ে এসে ওর পাশে গিয়ে বসে। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর সোজা করে বসায়, ওর ঘাড়ে পিঠে আলতোভাবে ধরে, অচেতন মুখটা ঝুলে পড়ে তার বাঁ হাতের ওপর।

ডানহাতটা পাশের ঘটির ভিতরে ঢুকিয়ে আবার বার করে এনে পানির ছিটা দেয় চোখেমুখে। ভেজা আঙুলে মুখটা মুছতে মুছতে ওর কানের কাছে বেশ জোরে বলতে থাকে, সকাল হয়েছে বাবা সকাল, চোখ ম্যাল—

উহ্ শব্দ করে মনু হয়তো বালিশ ভেবে শুয়ে পড়তে চায় মাসির উরুর ওপর। কিন্তু সে মুহূর্তে কাঁধে একটা প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় চোখজোড়া। মাসি বলতে থাকে, আর কটা দিন বাবা। এরপর তোকে আর একাজে পাঠাব না। সাড়ে সাত টাকা হয়েছে। আর আড়াই টাকা, ব্যস। দশ টাকা হলেই মুড়ি ভাজবার পয়সা হয়ে যাবে। তখন তোকে ইস্কুলে পাঠাব কেমন?

এসব কথায় মনু বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হয় না। গত তিন বছর ধরে সে প্যান্‌প্যান্ করছে পড়তে যাবে বলে আর এসবই শুনে আসছে রকমফের ভাষায়। সে জানে, এ মাসিমার

টালবাহানা। তবু চোখ কচলে সে উঠে দাঁড়ায়। বয়েস বারোর মতো, ছিপছিপে পাতলা গড়ন, উজ্জ্বল একজোড়া চোখ শুধু তার কৈশোরের অধিকার।

যে যাই বলুক, হৃদয়ের কতটুকু জায়গা ও দখল করে আছে, তা মাসি ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে চায় না। মনু না হয় তার আপন বোনের ছেলে নয়, তাবলে কেউ বলতে পারবে যে, ওকে অনাদরে রেখেছে কোনদিন? পঞ্চাশের আকালের সময় পোয়াতি মেয়েটা কঁকাতে কঁকাতে এসে পড়ল বটগাছের তলায়, তখন কি গাঁয়ের কেউ এসে এর তদারক করেছিল? সে অভাগী কেমন বাপের বেটী কে জানে! চাঁদের টুকরো ছেলেটাকে মাটিতে ফেলেই একেবারে স্বগ্‌গে চলে গেল। দুধের বাচ্চার মা না থাকলে তাকে পালাপোষা করা যে কেমন ঝকমারি, তা কেউ ভাবতে চায় না। পরের মুখে ঝাল খেয়ে সবাই বলে, মাসি এমন সোনার ছেলেটাকে শুঁটকি করে মারল। শত হলেও নিজের পেটে ধরেনি তো।

ভাত খাইয়ে মাসি কাপড় দিয়ে মুছে দেয় মনুর মুখটা, এরপর বেতের টুকরিটা ওর হাতে তুলে দেয়। গামছা দিয়ে মনু ঢেকে নেয় সার্টের ছেঁড়া অংশগুলো এবং টুকরিটা কাঁধের কাছে হাতে ধরে আস্তে আস্তে বারান্দায় গিয়ে নামে। মাসি এগিয়ে গিয়ে ওর পকেটে একটা কলা গুঁজে দেয়। আদর করে বলে, আজকে বেশি দেরি করিসনা, কেমন?

কারণটা কি জানতে চায় না মনু, সংক্ষেপে জবাব দেয়, আচ্ছা।

চোখের পাতা একেকবার বুঁজে যেতে চায় তন্দ্রার ভারে, কেবল মনের জোরকে জাগিয়ে রেখে চলতে থাকে। টিলা ছাড়িয়ে রেললাইনে যেতে মাঝখানে একটা ছোট নালা। পানি বেশি নেই। একটু সাবধানে গেলে কাপড় বাঁচে। তবু উপরের বাঁশের পুলটা দিয়ে পার হওয়াই নিরাপদ। রাতের বেলা সাপের দুলালরা হাওয়া খেতে বেরোয়, মানুষের চামড়ার গন্ধ যে তাদের লোভনীয় নয়, তা কে বলতে পারে? কোমর ভাঙা সাঁকোটা নড়তে থাকলেও মনু গতরের ওজন ঠিক রেখে ওপারে গিয়ে ওঠে।

সকালের দিকে ইস্টিশনের বাতিগুলো ভূতের চোখের মতো জ্বলে। কংক্রিটের বেঞ্চিতে যাত্রীরা উঠে বসছে। প্ল্যাটফরমে লোকজনের কিঞ্চিৎ নড়াচড়া শুরু হয়েছে। ইঞ্জিনটার পানি-খাওয়া এখনো শেষ হয়নি। সিগনালের কাছে দাঁড়িয়ে মনু ডানপাশে চেয়ে থাকে লাইনটার দিকে।

অন্ধকারই বলতে হবে। যে লাইনটা নিচের পাড়া থেকে ওপরে উঠে এসেছে, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পরও তা চোখে ধরা যায় না। মনু সামনে-পিছনে ডানে-বাঁয়ে তাকায় ঘুরে ঘুরে। কেউ আসেনি এখনো? সেই প্রথমে এসেছে?

কিন্তু সোনাভানের কি হল? অন্যদিন কাক ডাকার আগেই সে চলে আসে, অন্যেরা গিয়ে দেখে ওর টুকরি অর্ধেক ভরে গেছে। বয়েস দশ হলে হবে কি, ওর ভারি চিকনবুদ্ধি। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেউ পারে না। কয়লা তো অনেকেই কুড়ায়, কিন্তু তা দিয়ে পয়সা তুলতে পারে কয়জন? আর হোটেলওয়ালারা যা চশমখোর, বিনি পয়সার জ্বালানি পেলেই যেন বাঁচে। ভরা এক টুকরি কয়লার দাম পাঁচ ছ' আনার বেশি দিতে চায় না। ঠকায় একলা পেলেই।

সোনাভানের কাছে এসব জারিজুরি খাটে না। সে ছয় আনার জায়গায় আট আনা ঠিক আদায় করে নেয়। কেমন করে? না, মুখের ধারে। দেখতেও খারাপ নয়ম তাতে আবার এমন কায়দা করে কথা বলতে জানে, হোটেলওয়ালা বোকার মত খল্‌খল্ করে হাসে, কখন দু'তিন

আনা বেশি দিয়ে দেয়, টেরই পায় না। বেচারি সোনাভান। এত খাটুনির পরও ক'পয়সা আর মেলে? অথচ অচল কানা বাপটারে বলতে গেলে, সে-ই পালন করছে।

বাঁশের টুকরিটা কাঁধে আটকে ধরে মনু থাকে দাঁড়িয়ে, ইঞ্জিন কখন চলে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। কড়া হুইশেল আচমকা কানে বাজতেই হাত-পা চঞ্চল হয়ে ওঠে ওর। তাড়াতাড়ি গামছাটা কোমরে পেঁচিয়ে নেমে যায় লাইনের পেটে সানের পাকায় গড়া খাদটার ভিতরে। হাত দুয়েক চওড়া, আর দশ হাত লম্বা পাকা গর্তটা লোহার গন্ধ মেশানো ধোঁয়ায় ভরা। ধোঁয়াগুলো তাড়াতে চায় দু'হাত চালিয়ে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না, ফুসফুসটা শুধু ভরে ওঠে। এদিকে আবার পা কামড়ে ধরে পোড়া কয়লার গরমে। কিছুদিন আগেও ওর একজোড়া রবারের জুতো ছিল, তখন এতটা লাগত না। কিন্তু তাও গেছে ছিঁড়ে। নিচের ঠোঁটটা দাঁতে চেপে ধরে এক নিঃশ্বাসে অনেকক্ষণ কয়লা কুড়ায় সে, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মুখ খুলে হাঁপায় ওপরের বাতাসে।

কিছুক্ষণ পর ওপরের কাঁকরে খসখসে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। এ শব্দ তার পরিচিত। সোনাভান এসেছে। কিন্তু এত দেরি হল কেন আজ? কতক্ষণ কাজ বন্ধ রেখে সে কানখাড়া হয়ে বসে থাকে। খুক্‌খুক্ করে কাশছে কে? রূপভানের অসুখ করেছে নাকি?

গলা উঁচু করে দেখতে চায়, কিন্তু তাতে মজাটা নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সে চুপচাপ বসেই থাকে। সোনাভানের খাটো গলার আওয়াজ শোনা যায়, দ্যাখ রূপী, এখনো জ্বালাস যদি, বেশি ভাল হবে না। এমন অসুখ যেন আর কারো হয় না, না?

সে রূপভানকে দু'হাতে ধরে এনে খাদে নামিয়ে দেয়। এরপর নিজে নামে টুকরি নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার তীক্ষ্ণগলার প্রশ্ন, কে?

আমি, আমি মনু। ও জবাব দেয় মুখটা একটু তুলে।

ও। হঠাৎ হতাশ দুজন ; সোনাভান অভিমানের সুরে বলে, তুইনা কইছিল আমার আগে আসবি না?

মাসি তুলে দিল, আমি কি করব!

মাসি তুলে দিলেই হল। তুই ওপরে বসে থাকলি না কেন? সোনাভান মনুর টুকরিটা কাত করে দেখে বলে, দেখেছ সব কয়লাই যে—

মৃদু প্রতিবাদ করে মনু বলল, এ বুঝি সব কয়লা! তোর খালি বেশতি কথা। এই হাতড়ে দ্যাখতো। এখনো পাঁচ ছয় টুকরি হবে।

সোনাভান আর কোনো কথা বলে না। মনু বুঝল, ওর রাগ হয়েছে। অবশ্য এর কোনো মানে হয় না। তবু রাগ হয়েছে এ কথা ঠিক। কেউ তার আগে উঠে আসবে এ সে ভাবতেই পারে না। তাছাড়া মনু কথা দিয়েছিল, কোনদিন আগে এসে পড়লে সে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। সকলেই নিজের নিজের মতলবে আছে। নইলে এমন একটা কাজ সে করতে পারে? মনের ঝালাটা সোনাভান ঝাড়ে ছোট বোনের ওপর। রূপভানের পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলে, জলদি করিস না কেন, ভেদি?

রূপভানের শরীর সত্যিই খারাপ। একে তো জ্বর, তার ওপর খুসখুসে কাশি। গায়ে তেনার মতো ডোমাটা জড়িয়ে সে জড়সড় হয়ে বসেছে।

আধ—ঘণ্টার মধ্যে চারদিক ফর্সা হয়ে আস্নার সঙ্গে একে এক এসে হাজির হয় দলের প্রায় সবাই। কে আগে টুকরি ভরবে, তখন সকলের এই এক দিশে। একেকবারে আড়চোখে

সোনাভানের মুখের দিকে চেয়ে দেখে মনু, সে মুখ কালি করে বসে কয়লা কুড়াচ্ছে। প্রথমটা মনুর হাসি পায়। কিন্তু বারবার চেয়েও যখন ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না, তখন নিভে যায় ওর উৎসাহ। যাক, কথা না বলুক এতে কি আসে যায়?

বারে বারে কেশে ওঠে রূপভান। বড়বোন কটমটিয়ে তাকায়, বলে না কিছু। ওর গালে চোখের পানি শুকিয়ে আছে। শেষরাতের দিকে জ্বর একটু বেশিই ছিল, তাই কাঁথার নিচ থেকে জোর করে টেনে তোলায় সে কান্নাকাটি শুরু করেছিল। কিন্তু কাঁদলেই তো হল না। পেটে দানাপানি দিতে হবে তো। আর তাছাড়া সোনাভান নিজের ওপর পরখ করে দেখেছে, অসুখ করলে যদি কেউ বিছানায় পড়ে থাকে, তাহলে তা বাড়ে বৈ কমে না। অপরপক্ষে দাঁত কিড়মিড়িয়ে কষ্টটা সহ্য করে কাজে লেগে থাকলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়। বিশেষ করে, পরের বেলায় একথাটা আরো সত্য। সকালের আবছা আলোর আভায়, খাদের ভিতরে শুধু দেখা যায় কতকগুলো জট পাকানো মাথা ইঞ্জিনের ছেড়ে যাওয়া পোড়া কয়লার স্তূপের ওপর ঝুঁকে বসেছে, চামড়ায় সেটে-যাওয়া হাতগুলো নড়ছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর রূপভান ভীষণভাবে কাশতে থাকে। চোখ-মুখ লাল হয়ে শ্বাসরোধের জোগাড়। চরম মুহূর্তে তাল রাখতে না পেরে, হঠাৎ এক সময় পড়ে যায় সে কাত হয়ে। মুখের দুই কষে ফেনা দেখা দিয়েছে।

গেল, পড়ে গেল। কানা চেঁচিয়ে ওঠে এক পাশ থেকে। এইরে চোখ উলটিয়ে দিয়েছে। মনু লাফ দিয়ে উঠে দু'জনকে ডিঙিয়ে যেতে চায় কিন্তু তার আগেই সোনাভান নিজের বোনকে তুলে কোলের উপর নিয়েছে। চেঁচিয়ে বলে মনু, জল আনব? ওর মাথা ঘুরে গেছে। জল ঢালা দরকার।

সোনাভান ওর কথায় কান দেয় না। কানাকে বলে, এই ধর একটু ওপরে নিয়ে যাই।

তিনজনে ধরাধরি করে লাইনের পাশে যখন পাকার ওপর নিয়ে আসে রূপভানকে, খাদরে ভিতরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকে মনু। তার গলা ঠেলে কান্নার ঢেউ পাকিয়ে উঠছে। সোনাভান কেন কথা বলছে না? কাজ দিচ্ছে না? সে অনুভব করছে যেন তার পা জোড়া ডুবে যাচ্ছে কয়লা গুঁড়োর ভিতরে, সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যাচ্ছে সে নিজেও, নিচের দিকে। সে যদি চেঁচিয়ে উঠতে পারত তাহলে ভালো লাগত তার। কিন্তু কিছুই করতে পারে না। শুধু দুই ফোঁটা গরম পানি টপ্‌টপ্‌ করে ঝরে যায় গাল বেয়ে।

জোগাড়ে ছেলে গেদু, একদৌড়ে প্ল্যাটফরমের কল থেকে গামছাটা ভিজিয়ে এনে, তা চিপে চিপে রূপভানের চোখমুখ ভিজিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ পর ও চোখ মেলে চায়, সোনাভান তাকে কোলে রেখেই বলে ওঠে, আবার চাইলি। মরলি না কেন—তাহলে বাঁচতাম।

উঠে গিয়ে মনু কানাকে ফিসফিস করে বলে, আমার কাছে একটা কলা আছে। ও খাবে? দে তো দেখি।

কানা কলাটা নিয়ে এগিয়ে দিতেই সোনাভান বলল, ইস বুদ্ধি! কাশির গতরে আবার কলা খায় নাকি?

মনু ভেবেছিল, কলাটা ও নেবে। সে মনে মনে খুশিও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সোনাভানের কথায় ওর মুখটা দপ্‌ করে নিভে যায়। তীব্র অভিমানের সুরে বলল, না খায়. এভাবে ফেরত দেয় না। আমি যেন কেউ নই, কিছুই নই। সবদোষ যেন আমারই। আমি চাই না এ কয়লা। নিয়ে যা, সব নিয়ে যা, সব নিয়ে যা তুই।

বলতে বলতে ওর গলা ভেঙে যায় কান্নায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে খাদের দিকে যেতে থাকে। এক চোখে দেখতে পেলে কি হবে কানার মাথা বেশ পরিষ্কার। মনুর মনের ভাবটা বুঝতে পেরে পিছনে দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে ওর কাঁধ। এত মেহনতের জিনিশ ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে লাভ কি।

সোনাভান ওদিকে চেয়ে কি ভাবে। তার চোখের পুতুলিতে বেদনার ছায়া। মুখ নিচু করে, নিজের ডোমার পাড়ে বোনের চোখ-মুখ মুছে নিয়ে, ওকে কাঁধে করে উঠে দাঁড়ায়। টুকরিটার অর্ধেকও ভরেনি। এখনি বাড়ি যাওয়া যায় না। সকালের আরঙ থেকে সের খানেক চাল, চার পয়সার সিঁদেল শুটকি ও কিছু মিঠে আলু কিনে নিয়ে না গেলে, বাপের গালাগালে কানের পোকা পড়বে। খাদের কাছে এসে রূপভানকে ভাল করে বসিয়ে সে স্নেহস্বরে বলে, তুই একটু ব' আমি যাই, কেমন?

রূপভান মাথা তুলতে পারে না তবু ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। খাদের ভিতরে নেমে সোনা আবার কাজে লেগে গেল।

সূর্য উঠেছে। চট্টগ্রাম মেল আসতে বিশেষ দেরি নেই। গাড়ি আসার আগেই কয়লা কুড়ানো শেষ করতে হবে। তাই ওরা কাজ করে যায় ক্ষিপ্রহাতে।

কাঁধছেঁড়া সার্টের কলারে একটা ময়লা রুমাল বেঁধে টুকরি হাতে নিয়ে সবার শেষে আসে লালু, লাইনের ওপরে টুকরিটা রেখে আধ-পোড়া সিগারেটটা টানে খাদের ভিতরে দৃষ্টি রেখে। তার কপাল কুঁচকে যায়। চোখের তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকে। শেষ টান দিয়ে সিগারেটের মাথাটা ছুঁড়ে ফেলে খাদের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর দিকে নজর পড়তেই খাদের ভিতরকার সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

একটা ক্রুর হাসি খেলে যায় লালুর ঠোঁটে। সে বুঝতে পারে কেন হঠাৎ ওরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বিখ্যাত কালু চোরের ভাই, একসঙ্গে কাজ করলেও সঙ্গীরা কোনদিন তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। এজন্য তার ভাবনাও কিছু নেই। তবুও ওরা কেন ভাববে এমন? ইচ্ছা করলে সেও এদের শিক্ষা দিতে পারে। চড়চাপড় নয়, বেশ ভালোরকম শিক্ষাই।

ঝাঁকড়া চুলগুলো উলটিয়ে নিয়ে নিজের টুকরিটা ছুঁড়ে ফেলে খাদের ভিতরে। এরপর ঝুপ্‌ করে নামে একপাশে। সবার চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। লালু বরাবরই সকলের পরে আসে, আর একটা না একটা গোলমাল বাঁধায়। কোনদিন কাউকে চড় মারে, সামান্য কারণে বেফাঁস কথা বলে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না, সবারই কাছে ও দু'চোখের বিষ। কাউকে কোনো কথা বলতে না দেখে লালু দাঁত খিচিয়ে জিগগেস করে, এই, তোরা সব কয়লা কুড়িয়ে ফেললি যে?

সবাই চুপচাপ। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কাজ করতে থাকে একমনে। এইবার লালুর মেজাজ বিগড়ে যায়। সে চেঁচিয়ে ওঠে, কি কারো মুখে রা নেই কেন?

সোনভান নিচুগলায় বলল, রা করে কি হবে?

কি হবে মানে? তোরা সব কয়লা কুড়িয়ে ফেললি কেন?

সে কি আমাদের দোষ? কানা জিগ্‌গেস করে।

তোদের না কার? লালু পায়ের পাতায় কয়লার গুঁড়োতে ছটকা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, তোরা জানিস না যে, আমি আসব?

জানলে কি হবে? গেদু সাহস করে বলে, আমরা হাতপা গুটিয়ে বসে থাকব নাকি?

ওর কথা শুনে মনু এত দুঃখেও ফিক্ করে হেসে ফেলল। লালু তেড়ে ওঠে, এই তুই হাসছিস কেন রে?

হাসবে না তো কাঁদবে? কানা জানতে চায়।

না, কেন হাসবে? মানুষ চেনে না? লালু নিজের টুকরিটা নিয়ে এগিয়ে যায়, হুকুম করল, তোর অর্ধেক কয়লা ঢাল্।

লালুর হাবভাব দেখে মনু থতমত খেয়ে যায়। ওর বুকের ভিতরটা ভয়ে ধুক্ধুক্ করছে। ও যে রকম দাঙ্গাবাজ, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মনু হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নিষ্ক্রিয়তায় লালুর রাগ আরও বেড়ে যায়, সে ওর টুকরিটা কাত করে নিজের টুকরিতে কয়লা ভরতে থাকে ক্ষিপ্তের মতো। ওদিকে সকলের হাত থেমে যায়। ও করছে কি? এমন জুলুম মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে?

সোনাভান ওর কাণ্ডকারখানাটা দেখছিল। সে আর ঠিক থাকতে পারল না। একপাশ থেকে ঝট্ করে উঠে এসে ওর হাত ধরে, বলল, ওর কয়লা জোর করে নিয়ে যাচ্ছ যে!

নেবোনা তো কি করব? লালু তেড়ে ওঠে, নেবো একশ'বার নেবো। তাতে তোর কি? তুই আবার দরদ দেখাচ্ছিস কেন?

দেখাব, একশ'বার দেখাব। সোনাভান ডোমাটা কোমরে পেঁচিয়ে নির্দেশ দেয়, সব কয়লা ওর টুকরিতে রাখ। নইলে ভাল হবে না বলছি।

ভাল হবে না? কি করবি তুই? শালী কোথাকার—। বাড়াবাড়ি করলে জানিস, ধরে—একটা অশ্লীল ইংগিত করে লালু। সোনাভান এক ধাক্কায় লালুকে ফেলে দেয় খাদের কোণায়। তৎক্ষণাৎ উঠে লালু তেড়ে এসে আক্রমণ করে তাকে। ধস্তাধস্তি শুরু হল দু'জনে। সোনাভানের চুলের মুঠি ধরে লালু কয়লার গুঁড়োর ওপর ওর মাথাটা ঠুকতে থাকে। বেকায়দায় পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে সোনাভান। অন্যেরা এসে ছাড়াবার আগেই এক পশলা মার হয়ে গেল। সোনাভান খামচিয়েছে কম নয়, কিন্তু অতবড় জোয়ান মরদটার সঙ্গে পারবে কেন? ওর চোখমুখ অন্ধ হয়ে গেছে কয়লার গুঁড়োতে। দেখতে পাচ্ছেনা কিছুই। লালু উঠে দাঁড়িয়ে ওর কোমরে একটা লাথি মারল, সঙ্গে সঙ্গে আবার কঁকিয়ে উঠল সোনাভান। ততক্ষণে লালুকে অন্যেরা ধরে কাবু করে ফেলেছে! চিমটি খেয়ে তার হাত থেকে রক্ত পড়ছে। সে হাঁপাচ্ছে। বোনের হাল দেখে রূপভান বসে বসে কাঁদছে।

চিৎকার শুনে খাদের কাছে দৌড়ে এসেছিল সুবেদালি কনেস্টবল। ব্যাপারটা দেখে হাত নেড়ে তাড়া দিয়ে ওটে, ভাগ্। ভাগ্ এখান থেকে শয়তানের দল। নইলে মজাটা দেখাচ্ছি।

পশ্চিমা ইস্টিশন মাস্টার দুধ কিনতে এসেছিলেন প্ল্যাটফরমের ওপর। দূর থেকে জিগ্গেস করলেন, ক্যেয়া হুয়া সুবেদালি?

কয়লা টুকরিসমবেত সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে কনেস্টবল চলে ইস্টিশন মাস্টারের কাছে। বাজারের দিকে যেতে যেতে ওরা দূর থেকে দেখে হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলছে।

মনটা খারাপ হয়ে যায় লালুর। সবাই চলে গেলে একটা খালি মালগাড়িতে উঠে টুকরিটা ছুঁড়ে ফেলে, জোর করে নেয়া পোড়া কয়লাগুলো ফেলে এসেছে খাদেই। দরজার কাছে বসে পা ঝুলিয়ে! প্ল্যাটফরমের দিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ। প্রাণপণ খামচা দিয়ে ওর হাত থেকে চামড়া তুলে নিয়েছে সোনাভান। রক্ত চুইয়ে পড়ছে। গলা থেকে রুমাল খুলে নিয়ে হাতটা বাঁধলো। ও খুব ব্যথা পেয়েছে না? ওই বোকাগুলো হা করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল কেন?

প্রথমেই ছাড়িয়ে দিতে পারত না? ওদের সবার মাথায় গোবর, নইলে চোখের সামনে অমন মারামারি হয়? যাক, ভালোই হয়েছে। এখন বুঝবে ঠেলাটা। কেউ মিছামিছি অবহেলা দেখালে তাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে নেই।

এক সময় ওয়াগন থেকে নেমে চায়ের স্টলের চুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। স্টলের ম্যানেজারের সঙ্গে ও দোস্তি পাতিয়েছে। বোয়াম থেকে একটা মচমচে বিস্কুট বার করে চিবোতে চিবোতে অর্ডার দেয়, এক কাপ চা।

ম্যানেজার পাকা লোক। সাধে এমন একটা ছেলের সঙ্গে খাতির করেনি। বিদেশে এসে দোকানের ঝক্কি সামলানোর জন্যে অনেক রকম লোকের সঙ্গেই পরিচয় রাখতে হয়, নইলে, কোন্ সময় কোন্ বিপদে পড়ে তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। তাছাড়া লালু প্রায় সব কাজেরই কাজি। মাঝে মাঝে চা বিস্কুট খাইয়ে হাতে রাখায় তাকে দিয়ে এমন কাজ হাসেল হয়, যেগুলো কেবল পয়সা দিয়ে সমাধা করা মুশকিল।

বাজারের অলিতে গলিতে বিনা কাজে হেঁটে বেড়ায় লালু, এরপর দুপুর গড়িয়ে এলে জাহাজটার সিঁড়িতে গিয়ে বসে। কতক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে ওর মনে হয়, গা ডুবিয়ে গোসল করে নিলে কিছুটা ভালো লাগতে পারে। মেঘনার পারে ফেলে রাখা পাথরের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চকচকে পানির স্রোত এঁকেবেঁকে চলছে। অন্যদিন হোটেলওয়ালাদের কাছে কয়লা বিক্রি করে এসে সবাই একসঙ্গে গোসল করত, পানি ছিটাত, সাঁতার কাটত। আজ সে একা। তবুও পানিটা বেশ লোভনীয়। লালু এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে লোকজন আছে কি না। পুলের নিচেকার ঘাটে অনেকে গোসল করছে। এছাড়া নৌকায় ও জাহাজে সারেঙ মাঝিরা আছে। কে কার দিকে এত নজর রাখে। আর ওর বয়েস তো খুব বেশি নয়। দাঁড়িগোফ এখনো উঁকি দেয়নি। অবশ্য আলাদা কাপড় থাকলে কিছুতেই সে ন্যাংটা হয়ে গোসল করত না।

জামা-কাপড় খুলে রেখে কোমরের মিহি দড়িটার রুমালটা বেঁধে যেমন-তেমন একটা নেংটি পরে, এরপর একদৌড়ে গিয়ে পানিতে পড়লো।

গোসল সেরে কাপড়-চোপড় পরার পর গাছের ছায়ায় এসে বেশ খিদে লাগে ওর। কিন্তু এখন ভাত কোথায় পাবে? আজকে কয়লা কুড়োয়নি, কাজেই বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। গেলেই ভাউজ এসে ধরবে, তার জন্যে পান-সুপারি এনেছে কি না, জিনিশ কিনে কত পয়সা বাড়তি হল। যদি বলে, আজকে কাজ করেনি, তাহলে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বলবে ফুর্তি করে উড়িয়েছে।

কোনো ফয়সালা করতে না পেরে আবার হাঁটতে হাঁটতে ইস্টিশনে এসে স্টলের ম্যানেজারকে বলে, দোস্ত, সাত আনার পয়সা দেন তো। বিশেষ দরকার।

ম্যানেজার ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে নিয়ে প্রয়োজন সত্যি আছে কিনা, তা পরখ করে নেয়। এরপর কাঠের বাক্স থেকে একটা আধুলি বের করে দেয়। কোনো কথা না বলে বেরিয়ে আসে লালু।

রাত আটটার গাড়ি ইস্টিশন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর লাইন পেরিয়ে এসে গ্রামের রাস্তাটার ওপর নামে ও। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দুই পাশের আমগাছের ডালপালাগুলো পথের উপর ঝুঁকে অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তুলেছে। তবু চলতে বিশেষ কষ্ট হয় না ওর। এই পথে গভীর রাত্রেও সে এতবার হেঁটেছে যে, কোথায় গাছের শিকড়, কোথায় গর্ত, এসব তার মুখস্থ হয়ে গেছে। কাঁঠাল বাগিচার ভিতর দিয়ে হেঁটে এসে একটা

ছনের ঘরের পিছনে থেমে গেল ও। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল। দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ধূমপান করার পর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে চলে এলো ঘরের কোণায়। ইখরের বেড়ায় অনেক ফাঁক। ভিতরে বাতি জ্বলছে। একটা ফাঁকে চোখ রেখে দেখল, সোনাভান একটা বদনা দিয়ে কা'র মাথায় পানি ঢালছে। নিশ্চয়ই রূপভান। তাহলে ওর অসুখটা বেড়েছে? না বাড়লে এমন কাতরস্বরে কোঁকাত না। সোনাভানের চুলগুলো উসকো-খুসকো। চোখে বিহ্বল চাউনির স্থিরতা, বাপটা হোগলার উপর পড়ে আছে এক ধারে। এত সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? ও এমনি চামার, খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনাই যেন থাকে না।

লালু ডান পকেটে হাত রাখে একটি জিনিশের ওপর। সে কি ডাক দেবে ওর নাম ধরে? কিন্তু কেমন করে দেবে ডাক? ও যদি বুঝতে পারে কে ডাকছে, তাহলে হয়তো কথাই বলবে না। তাহলে নিজে না খেয়ে, অর্ধেক পয়সা দিয়ে এমন কাকুতি—মিনতি করে যে জিনিশটা এনেছে, তা না দিয়েই কি চলে যাবে সে?

খানিকক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকে ও। এরপর ভিটির পাশের সরু পথটা দিয়ে হেঁটে চলে আসে দরজার সামনে। বাঁশের দুয়ার, একটু টান দিলেই ফাঁক হয়ে যাবে। কিন্তু সকালবেলার ঘটনাটা মনে পড়ায় ও দমে যায়। সে এখন কি করবে?

হঠাৎ এক সময় এগিয়ে দরজার একটা খাপে টোকা দেয় আঙুলে, প্রথমটায় মৃদু, এরপরে একটু জোরে আওয়াজ হয়। ভিতর থেকে আচমকা প্রশ্ন আসে, কে?

লালু সাহস সঞ্চয় করে জবাব দেয়, দরজাটা একটু খোল না।

কে তুমি? মনু নাকি? একটানা দরজাটা খুলে চেয়ে দেখতেই সোনাভানের মুখ থেকে ফুটে বেরোয়, ও তুমি? কেন এসেছ এখানে? যাও চলে যাও। নইলে বাজানকে ডাক দেব।

ঘর থেকে ছড়িয়ে পড়া ম্লান আলোর আভায় লালুর মুখটা দেখা যাচ্ছে, ডান হাতটা বাড়িয়ে অপরাধীর মতো ও বলে, এই নাও বেদানাটা। রূপভানকে দিও।

সোনাভান বেদানাটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে। ক্ষেপে উঠে বলতে থাকে, চাই না তোমার জিনিশ! তুমি যাও।

ওর মুখের ওপর দরজাটা সাঁ করে লাগিয়ে দেয় সোনাভান। লালু কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়। কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে উঠোন থেকে।

অনেক রাত হয়েছে। সকালের ট্রেন ধরার জন্যে দূর থেকে যারা এসেছে, সিমেন্টের বেঞ্চি ও প্ল্যাটফরমের ওপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে তারা। লালু একটা মাঝারি রকম পাথর গোড়া করে এনে, তা মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়ল ওয়াগনের ভিতর।

সকালে ঘুম ভাঙলে চোখ কচলিয়ে উঠে বসে ও দেখে, পুবদিকটা লাল হয়েছে। একটু পরই সূর্য উঠবে। টুকরিটা নিয়ে মাটিতে নামাতেই হঠাৎ ওর চোখে পড়ে ওয়াগনের পিছনটায় লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, দলের কয়েকজন। অন্য সময় হলে লালু ফিরেও চেয়ে দেখত না। কিন্তু এখন কেমন একটা খটকা লাগে ওর মনে। এখন তো মিছিমিছি এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়।

ও কাছে গিয়ে দেখে মনু ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কথা বলার ইচ্ছে না থাকলেও, ওর মুখ থেকে আপসে প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, কি হয়েছে রে?

কানা জবাব দেয়, কি হয়েছে ওখানে গিয়ে দেখ গে।

না যাওয়াই ভালো। গেদু আপন মনে আওড়ায়, গেলে মার খেয়ে ফিরতে হবে।

কেন? মার খেয়ে ফিরতে হবে কেন? কঠিন মুখে লালু প্রশ্ন করলো।

কেন দেখনা গিয়ে। আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কে? হঠাৎ এক পা এগিয়ে লালু ওদের মুখের দিকে তাকাল।

গেদু বলল, কে আবার? ওই কনেস্টবল শয়তানটা। আমাদের আর কয়লা কুড়াতে দেবে না।

দেবে না? ওর বাপের ধন নাকি? লালু মাথা ঝাড়া দিয়ে বলে, চলতো দেখি।

টুকরিটা লাইনের ওপর ফেলে রেখে লালু লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে যায় পোড়া কয়লার খাদের দিকে। আগে যারা দৌড়ে চলে এসেছে, তাদের বিশেষ উৎসাহ নেই। তবু ও যখন যাচ্ছে ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্যে তারাও আস্তে আস্তে এগুতে থাকে।

সুবেদালি কনেস্টবল পাকায় বসে বিড়ি টানছে। তার হাতে একটা ব্যাটন। লালু এসব অনেক দেখেছে। পরোয়া করে না মোটেই। সামনে গিয়ে সোজা জিগ্‌গেস করে, মনু কাঁদছে কেন?

ও লালু নাকি? বিড়ি খাবে? উঠে দাঁড়ায় সুবেদালি, যেন কত খাতির।

না আমার কথার জবাব দাও।

কনেস্টবল শুক্‌নো মুখে বলে, কেন কাঁদছে আমি তো কিছুই জানি না।

কিছুই জান না? তুমি ওদের ছোটানি দাওনি? মারনি? লালু তীক্ষ্মস্বরে জিগগেস করে।

কনেস্টবল ওর কথার সুরে থতমত খেয়ে যায়, আমতা আমতা করে বলে, ছোটানি দিয়েছি। তবে মারিনি। কে যেন পড়ে গিয়েছিল লাইনে। বোধ হয় চোট লেগেছে।

এইবার লালু দুই চোখের তারা থেকে ছিটকে পড়ে আগুন। ফিরে আসতে আসতে বলল, বোধ হয় চোট লেগেছে! রাখ দেখাচ্ছি মজাটা!

কনেস্টবল যেন প্রমাদ শুনে, উঁচু গলায়, ডাক দিয়ে বলল, অত রাগছিস কেন লালু? শুনে যা না একটু! শুনে যা—

লালু প্রত্যুত্তর দেয় না। ওর কথা শুনে বাকি সবার সাহস ফিরে এসেছে। কান্না থেমেছে মনুর। কনেস্টবল যখন তাড়া দিয়েছিল তখন ও হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। বুড়ো আঙুলের নখ কিছুটা আলগা হয়ে গেছে। রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। কানা ওর পুরনো গামছা থেকে কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছে ওর জখমটা। লালু সকলের আগে আগে চলছে। এক সময় চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, শালারে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

পদ্মমাসির ওখানে ওরা গোল হয়ে বসল উঠানের ধারে ঘাসের ওপর। সোনাভান ছাড়া সবাই এসেছে। রূপভানের অসুখ না বাড়লে ও নিশ্চয় আসত। অনেকক্ষণ ধরে ওদের পরামর্শ চলে, কিভাবে এর দাদ নেওয়া যায়? কানা বলে, ওর ঘরতো চিনি। রাত্রে গিয়ে জানালার ফাঁকে পানি ঢেলে আসব ওর মাথায়।

তাতে কি হবে। আমাদের মারটা যাবে কোথায়? গেদু প্রশ্ন করে।

সবার আলোচনার পর লালু যে বুদ্ধি বাৎলালো, তা মেনে নিল সকলে। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর না হলে চলে না।

যে সময়ে ওরা কয়লা কুড়াতে যায়, পরের দিন ঠিক সেই সময়ে আবছা অন্ধকারে

একটি ছায়ামূর্তির দল হামাগুড়ি দিয়ে লাইনের ঢালুতে গিয়ে বসে। একজন বারে বারে মাথা তুলে দেখে, কনেস্টবল আসছে কিনা। ইঞ্জিনটা হুইশেল দিচ্ছে। একটু পরেই আসবে কয়লা ছাড়তে, আর পানি নিতে। চারদিকে আরো একটু ফর্সা হয়ে আসতেই ওরা দেখল, সুবেদালি খাদের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যাটনটা বগলদাবা করে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাবার জন্যে মুখ নিচু করতেই একটা পাথর গিয়ে পড়ল তার হাতের কব্জিতে। সঙ্গে সঙ্গে উহু করে হাত ঝাড়া দিয়ে উঠল।

এরপর সামনে চেয়ে কিছু ভাববার আগেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর এসে পড়তে থাকে তার মাথায় ঘাড়ে পিঠে উরুতে। হাত দিয়ে কয়টা আর ফেরানো যায়। সহ্য করতে না পেরে অকস্মাৎ প্ল্যাটফরমের দিকে দেয় ছুট। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। একি ভূতের কারবার? না, সুবেদালির মাথায় খেলে, নিশ্চয় ওই ছোকরাদের কাজ।

বিকেলবেলায় পদ্মমাসির ওখানে আবার বৈঠক। সবাই গুম হয়ে বসে আছে। শিক্ষা তো দেওয়া হল, কিন্তু কাজের কি করা যায়? পাথরের ঢিল খাওয়া সত্ত্বেও সে তো পাহারা দেয়া বন্ধ করবে না। এদিকে, কয়লা না কুড়োলে উপোস থাকতে হবে। কিন্তু করা যায় কী?

চল্, শালার মালগাড়ি ভাঙি। কানা বলে, তা নইলে, আমরা না খেয়ে মরব নাকি?

এ—প্রস্তাবে কারো মনে উৎসাহের সঞ্চার হয় না। সব চুপচাপ। পদ্মমাসি এক সানকি মুড়ি এনে ওদের মাঝখানে রাখে। বলে, নে, তোরা খা।

কোনো কথা না বলে ওরা মুড়ি চিবোতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর লালু সোনাভানকে বলে, এই, এক গেলাস পানি নিয়ে আয়।

কপাল কুঁচকে তাকায় সোনাভান। বলে, কি ঠেকাটা আমার পড়েছে?

আমাদের দেখে একটু মায়া হয় না? লালু হাসতে থাকে, তোর রাগ এখনো পড়েনি, না?

না, পড়েনি। কতকক্ষণ মুখভার করে বসে থাকার পর সোনাভান উঠে যায়। এক বদনা পানি এনে ঝপ্ করে মাটিতে রেখে বলে, নাও, গেলো।

ইস্, তেজ কি দেখ না। লালু বদনার নালটা মুখে দিয়ে চুক্চুক্ পানি খেতে থাকে।

ওদের পিছনে সুবেদালি কনেস্টবল কখন এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায়নি। প্রথমে মনুর সে দিকে নজর পড়তেই সে শিউরে উঠে। কানাকে চোখ ইশারা করে। এরপর সকলের গোচরে আসে ব্যাপারটা। লোকটার দিকে তাকিয়ে কারো মুখে অনেকক্ষণ কোনো রা ফোটে না। এখানে কেউ তাকে আশা করেনি। কি মতলব? মাথায় গামছা বাঁধা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় জখম হয়েছে। ওরা সবাই স্তব্ধ হয়ে বোবার মত বসে থাকে।

লালু ওর দিকে চোখ লাল করে তাকায়। দাঁত খিঁচিয়ে বলে, তুমি কি চাও এখানে?

একটা দরাজ-হাসি ফুটে ওঠে সুবেদালির মুখে। একপাশে ঘাসের ওপর বসে পড়ে বলে, চাইনা কিছু। তোমাদের কাছে একটু বসতে এলাম। আমার ওপর খুব রেগে আছিস না?

ওরা কেউ কিছু বলে না। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকে। লালু একটা ঘাসের পাতা ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটে। মুখে হাসি ফুটিয়ে সুবেদালি মিঠাস্বরে বলে, জানি তোমরা খুব রেগেছ। কিন্তু আমি কি করবো।

পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেটটা বার করে কনেস্টবল একটা একটা করে এগিয়ে দেয় সবাইকে। প্রথমটায় নিতে ইতস্তত করলেও লালু যখন নিয়েছে, এরপর কেউ আপত্তি করেনি। বিড়ি টানতে টানতে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল কনেস্টবল। ওর হাতের কব্জি ও

কপালের বাঁদিকটা ফুলে উঠেছে। এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, এমনি ভাব সকলের মৌনতায়। লালুর ঠোঁটের কোণে একসময় দুষ্টু হাসি খেলে যায় মাত্র।

আলাপ শেষ করে উঠে আসবার সময় সুবেদালি জিগ্‌গেস করে, আমি যে ভাবে বললাম, সেভাবে তোরা কাজ করতে পারবি তো?

সকলে সায় দেয় ঘাড় নেড়ে।

পরদিন সকাল বেলা। একটু ফর্সা হয়ে আসতেই দেখা যায়, লাইনের খাদের ভিতরে কয়লা কুড়ানো দল একজোট হয়ে কাজ করে চলেছে। তাদের হাতে অসম্ভব ক্ষিপ্রতা। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কয়লা কুড়ানো শেষ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি গর্ত থেকে উঠে টুকরিগুলো মাথায় নিয়ে ওরা চলতে থাকে লাইনের পাশের পথ দিয়ে। ঘন পায়ে চলতে থাকে ওরা সাতজন। চলতে থাকে, আর মাঝে মাঝে দু'একজন পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে। যতই এগিয়ে যায় বাড়তে থাকে হাঁটার গতি। কিন্তু আর বুঝি পারা গেল না। ওই যে দৌড়ে আসছে কনেস্টবল। ব্যাটন হাতে তেড়ে আসছে। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ইস্টিশন মাস্টার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি আদশে দিচ্ছেন। কয়লার টুকরি মাথায় ওরা দৌড়াতে থাকে প্রাণপণে।

না, এই ধরে ফেলল। লাইনের ঢালু পথ দিয়ে ছুটে ওরা নেমে গেল নিচের রাস্তায়। তাদের পিছনে তেড়ে আসা লোকটাও নামল। ওরা ছুটতে পারছে না আর।

পা জড়িয়ে আসছে। পিছনে চেয়ে দেখে, সেই সুবেদালি কনেস্টবল।

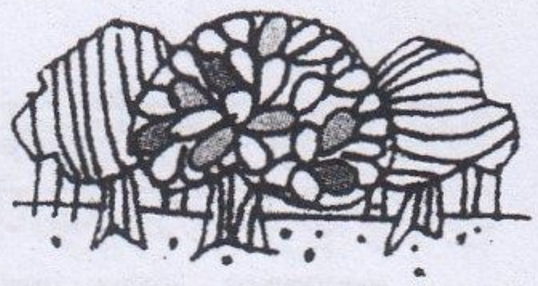
এই থাম্ থাম্। আর দৌড়াতে হবে না। কনেস্টবল হাত নেড়ে বলল।

ইচ্ছে থাকলেও, ওরা আর দৌড়াতে পারবে না। একে তো খালি পেট, তার ওপর একেক জনের মাথায় বোঝার ভার কম নয়। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে সব।

কনেস্টবল কাছে এসে পিছন দিকের অনেক দূর পর্যন্ত তির্যক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে বলল, শালার মাস্টারকে আর দেখা যাচ্ছে না। এইবার একটু জিরিয়ে নিতে পারিস। এত চুরি করেও পেট ভরে না লোকটার। চোরাইমাল বুকিংয়ের ঘুষ তো আছেই, মাইনেও কম পায় না। তার ওপর আমাদের খাটিয়ে মারে। বলে বাজারটা কর, ওষুধ আনো, ঘরদুটো সাফ করে দাও। যেন কেনা গোলাম। শেষ পর্যন্ত নজর পড়েছে গিয়ে পোড়া কয়লার ওপর। বলে কিনা সুবেদালি, কয়লার জন্য এত পয়সা খরচ করে লাভ কি, একটু দেখাশোনা করলেই অনেক টাকা বেঁচে যায়। চামার কোথাকার। যাক্, তোরা আরো একটু সকালে আসার চেষ্টা করিস্। তাহলে আর এত দৌড়ানো লাগবে না।

একটানা কথাগুলো শেষ করে থুতু ফেলে লাইনের দিকে ফিরে যায় সুবেদালি কনেস্টবল। আস্তে আস্তে ওরাও হাঁটতে থাকে বাজারের পথ ধরে। তখন কয়লার টুকরিগুলোর ওপর সূর্যের নরম আলো ছড়িয়ে পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে।

এপ্রিল, ১৯৪৮



একটি চেয়ারও নেই। ছেলেমেয়েদের বসার জন্যে ঘরের পালার সঙ্গে বাঁধা তিনটে বাঁশের মাচান, আর তার সামনে একখণ্ড চতুষ্কোণ কাঠের নিচে গোটাচার খুঁটি লাগিয়ে যে-জিনিশটি তৈরি করা হয়েছে, তারই একচ্ছত্র সম্রাট মাহমুদ পণ্ডিত। মনকাঁটার লাঠিটায় ভর করে এখানে এসে উপবিষ্ট হন প্রত্যহ—ঘড়ির দোলক যেমন একই তালে দোলে, সূর্য যেমন একই ছন্দে পূর্বাকাশে উদিত হয়।

মুখ দেখলে যে-কেউ ভাবতে পারে লোকটা কারুর না কারুর ওপর যেন সবসময় রেগে আছে। লম্বা হাড়গোড় চেহারা। বয়স ষাট পেরিয়ে গেলেও দেহের কাঠিন্যটা প্রৌঢ়ত্বের। তবে গেঁটেবাত তাকে পঙ্গু করে রেখেছে অনেকটা, কিন্তু তার মুখের অপরিসীম ক্লান্তির কারণ অন্য। বছর তিনেক হয় সহধর্মিণী বিগত, বিষয়সম্মত্তি পিতৃপুরুষের আমলেই খতম, তার ওপর রয়েছে দৈনন্দিন কাজের ঘানিটানা। পাঁচটি ছেলের মধ্যে একেবারে বড়টিকে অনেক চেষ্টায় কলেজ পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন এক মেয়ের প্রেমে পড়ে পড়াশুনা করতে পারেনি, মেয়ের বাপ তাদের বিয়ে দিতে অসম্মত হওয়ায় এক রাত্রিতে দুজনে পালিয়ে গেছে কোথায়, খোঁজ নেই। তার ছোট দুটি ছেলে লেখাপড়ায় গোবরগণেশ; একটি কাছাকাছি বন্দরের কোন এক হোটেলে খানসামার কাজে ভর্তি হয়েছে, আর একটি পাঁচটাকা পুঁজি নিয়ে করে ডিমের ব্যবসায়। বাকী দুজনের মধ্যে একেবারে ছোট ছেলেটি তার সাথেই থাকে, আর এর বড়টি রান্নাবান্না করে।

আমতলায় এই চৌচালা স্কুল ঘর। ওপরে টিনই বটে। কিন্তু ঘরের বেড়া নেই একদিকেও, চারপাশ খোলা। বেড়া এককালে হয়ত ছিল, পাড়াপড়শি মেয়েরা উনুন ধরাবার জন্য একখানা দুখানা করে তরজা নিতে নিতে অবশিষ্ট নেই কিছুই।

পিছনকার বনঝোপে ছায়া পড়ে। তরুণ টিকটিকি একটা ঘাস-ফড়িং ধরে নিয়ে ছুটে পালায়, ডেফলডাঁটার ভিতর থেকে ব্যাঙটা লাফিয়ে পড়ে গর্তে, বাঁশঝাড়ের শুকনো পাতা ঝরে মৃদু বাতাসে, একটা ভিখারী মেয়ে তার নিত্যকার সফরে যায় এই পথ দিয়ে, দু'একজন লোক যাতায়াত করে এই পথে সবসময়, পথের দিকে পিঠ ফিরিয়ে পণ্ডিত করে যান আপন কর্তব্য। ছেলেগুলো উচ্চৈঃস্বরে পড়ে, গোলমাল করে। পড়াশুনার ফাঁকে কোন কোনদিন তন্দ্রা এসে যায় পণ্ডিতের, বাঁশের খুঁটিতে মাথা রেখে চোখ বুঁজে থাকেন কতক্ষণ। এমন আলসেমি কয়েক বছর আগেও তাঁর ছিল না, অথচ আজকাল তা অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছে।

এমনি করে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আসে। মাথাটা একটু কাত করেছিলেন সেদিনও।

ঐ রে পিয়ন যায়! সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি ছেলে। এদের লক্ষ্যবস্তু পিয়ন নয়, তার পিঠে ঝুলানো ভারী ব্যাগ, আর হাতে ঘুঙুর-বাঁধা বর্শা। হাঁটার তালে তালে ঝন্‌ঝন্ করে বাজছে ঘুঙুর।

কথাটা পণ্ডিতের কানে গেল। তিনি লাফিয়ে উঠলেন, কই রে পিয়ন?

ওই যে পথে হুজুর, ঘুঙুর বাজিয়ে যাচ্ছে।

এই পিয়ন, পিয়ন! দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ডাকলেন, একটু শোনো।

কে? পিয়ন ফিরে তাকাল, একটু থেমে বলল, কেন ডাকছেন?

দৌড়ে কাছে গিয়ে পণ্ডিত জিগগেস করলেন, বিল এসেছে? আমাদের বিল?

জ্বী না। কিছু না ভেবেই জবাব দিল ডাকপিয়ন।

গত নয় মাস ধরে একই কথা বলে এসেছে সে, ঠিক একইভাবে মোটা ঠোঁটজোড়া ফাঁক করে। আজও নতুন কিছু বলবার ছিল না। হাত নাড়তেই লাঠির ঘুঙুরগুলো ঠুন্‌ঠুন্ করে বাজল আবার।

পণ্ডিত মুখ ভেংচিয়ে উঠলেন, না। না কেন? পাল্কি চড়ে আসে নাকি বিল? নয় মাস ধরে আটকা পড়েছে, কি খেয়ে বাঁচি, বেঞ্চি আর কাঠের ফলক? পেয়েছে কি শালারা, টের পায় না?

পিয়ন বেজার হল। তার কাছে বকবক্ করার অর্থ কি? রাগ করে বলল, বিল আসে না তো আমার কি দোষ? আর জায়গা পেলেন না? ভারী তেজ দেখান আমার উপর, হুঁ।

আহা তোমাকে বলছি না। তুমি রাগ কর কেন। আমি বলছিলাম কর্তৃপক্ষের একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত। পনেরো টাকা তো বেতন, তাও না পেলে কেমন লাগে বল তো।

পিয়ন বিদ্রুপের সুরে বলল, আপনারা বিদ্বান মানুষ। বোঝেন সবই। জানেন তো এ বিল ছাড়াও তাদের অনেক কাজ।

কাজ! উচ্চারণ নয়, যেন একটা পাথর ভেঙে গেল। তাঁর মুখ থেকে আর কোনো কথাই বেরুল না। ক্রোধে আর উত্তেজনায় ফেড়ে পড়তে চাইল হৃৎপিণ্ড; অসহায় বিলটা হয়ত ঘুরছে বড় সাহেবদের চোখাচোখা কলমের নিচে, অথবা চিরতরে ডুব দিয়েছে কোন ইনস্পেক্টরের লালফিতে বাঁধা ফাইলে। বড় বড় পরিকল্পনার পাশাপাশি একটা ঘরকাটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ, আর তার মধ্যে হিসেবের নিচে মফঃস্বলের নগণ্য শিক্ষকের দস্তখতের কোন মূল্যই হয়তো নেই।

এক গেলাস পানি আর দুতিন মুঠো চালভাজা নিয়ে তার ছেলেটি এসে হাজির। বেলা এগারটা, তার খাবার এসেছে। মাচানে বসেই পণ্ডিত গেলাসের পানিটুকু একচুমুকে খেয়ে ফেললেন, অসন্তুষ্টভাবে কুড়ুকুড়ু করে চিবোতে লাগলেন চালভাজা। দুতিন মুঠো চালেই সেরে নেন নাশতার কাজ, তারপর চারঘন্টা পড়িয়ে গিয়ে সারাদিনে একবেলা আহার করেন। এ তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। একদা দুধের ওপর তার ভারী আকর্ষণ ছিল, এখনও আছে; কিন্তু সংসারে খুব অল্প আকাঙ্খাই পূর্ণ হয়। হোটেল থেকে ছেলেটা কিছু কাঁচা পয়সা পাঠালে তা দিয়ে দুধ কিনে খেয়ে ফেলেন চুপিসারে। কিন্তু এও কদাচিৎ ঘটে। কেনাবেচায় লাভ দেখা দিলে বাপের জন্য দু'একটা মুরগির ডিম রেখে যায় কারবারী ছেলেটা। বাপকে একটু শান্তি দেবার চেষ্টা করে ওরা, কিন্তু পারে না। যা দিনকাল পড়েছে। ছেলেটা দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্ করছিল। হঠাৎ এক মুহূর্ত সাহস সঞ্চয় করে যখন বলে ফেলল ঘরে আজকে রান্নার কিছু নেই, তখন পণ্ডিত হৈ হৈ করে উঠলেন। গতিক সুবিধের নয় দেখে, ছেলেটা এক দৌড়ে পথে নেমে গেল।

এদিকে পাঠ্যবইতে ছাত্রদের মনোযোগ গভীর হয়ে ওঠে। মুখে ফেনা তুলে ভন্‌ভন্ করে পড়তে থাকে ওরা ঃ লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

পণ্ডিত বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, খালি পড়া আর পড়া। পড়ে কি করবি রে তোরা? মাদী ঘোড়ার ঘাস কাটবি? হতচ্ছাড়ার দল। এদিকে আয়।

ওরা কাছে আসতেই সবার মুখ নিরীক্ষণ করে পণ্ডিত জিগগেস করলেন, এই শাহু কইরে, হ্যাঁ শাহজাদা কই?

ছেলেরা সব নীরব।

কি? কথা বলিস না কেন? মাচানের কাঠে একটা থাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, আসেনি সে?

এসেছিল। বাড়ি গেছে। বলল একজন।

নওয়াবসাব বাড়ি গেছেন কেন?

বিড়ির কাজে ঢুকেছে। তার মার পেটব্যথা।

হঠাৎ সটান দাঁড়িয়ে পণ্ডিত খাড়া হুকুম দিলেন, এই করিম, যা তো দুইজন। কানে ধরে হেঁচড়ে নিয়ে আয়। দেখিস্ মাটিতে পা লাগে না যেন। বিড়ির কাজ, হারামজাদা।

মিনিট দশেক পরে ছেলেটার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনে দুইজন। ও দাঁড়াল এসে অপরাধীর মত—কালো, ডাগরচোখ গোলগাল চেহারা। শুখার গুঁড়ো লেগে আছে সারা শরীরে, ঘাম চিটচিটে গতর।

কই ছিলি এতক্ষণ? পণ্ডিত ওর একটি কান টেনে ধরে ধমকে উঠলেন, কই ছিলি, ক'।

কোন জবাব দিল না শাহজাদা, মুখটা নিচু করে রাখে।

ওর নীরবতায় পণ্ডিত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, কি, নওয়াব সাবের মুখে কথা নেই কেন? হায়রে আমার ভালো ছেলে। ভেজা বেড়াল, বদমাশ। তিনি হবেন মহাপুরুষ। দেশের নেতা, হুঁ। তোর ভালোমানুষী না বার করে ছাড়ব না বুঝলি? মানুষ চিনে রাখ্।

সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে চড় মারলেন একটা। ভয়ে ও কোন শব্দ করলো না।

ছেলেটা কেবল বুদ্ধিমান, আর পড়াশোনায়ই ভালো নয়, ওর ভিতরে ভবিষ্যতের এক বিরাট প্রতিভা ঘুমিয়ে আছে, এই পণ্ডিতের বিশ্বাস। সুযোগ পেলে তিনি যেখানে—সেখানে ঘোষণা করে বেড়ান এ ছেলে বাঁচলে একদিন হবে দেশের মণি। শিক্ষক-জীবনের অনেক দিন পর ওকে আবিষ্কার করেছেন, হাঁ আবিস্কারই। সারা-জীবন বকবক্ করে কি লাভ, যদি না একটি মানুষ গঠন করা যায়। তাঁরও আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল অনেক, কিন্তু বাস্তবের কঠোর আঘাতে সবই ভেঙে গেছে তাসের ঘরের মতো। তবু যদি আর একটি জীবনে নিজেকে সঞ্চারিত করা যায় তা হলে এই ব্যর্থতার মোহনায় জাগবে পলিমাটির ডাঙা! ভাবতে ভাবতে পণ্ডিত মাহমুদের চোখমুখ উজ্জল হয়ে উঠত।

থাপড় খেয়ে শাহুর মনে হলো পায়ের নীচ থেকে যেন পৃথিবীটা সরে গেছে, চোখ অন্ধকার হয়ে এল। বাঁ-হাতে গালটা চেপে ধরে ও বসে পড়ল মাটি লেপটে। একটা বাঁশের কঞ্চি পড়েছিল দোরগোড়ায়, তাকে শাসন করার জন্য পণ্ডিত তা হাতে তুলে নিলেন, তারপর চলল তাঁর উন্মত্ততা। একটানা সপাংসপাং আওয়াজ উঠল।

পণ্ডিত সাব, হুজুর! কাতরে উঠে এবার শাহু পড়ে গেল মেঝের উপর। থুথু ফেলল একমুখ। থুথু নয় রক্ত। পণ্ডিত শিউরে উঠলেন, কাঁপতে লাগল ছেলেগুলো, কিন্তু আশ্চর্য, কেঁদে উঠল না।

ওর মুখের গলগলে লালরক্ত ক্রমশ লেপটে গেল ধূলায়।

বাড়ি আসার পর ও চিন্তায়ই আচ্ছন্ন, ভুলতে পারছেন না।

দীর্ঘ শিক্ষকজীবনে কোন ছেলেকে বেত না মেরেছেন এমন নয়, কিন্তু এমন তো কোনদিন হয়নি? এমন ক্ষিপ্ততা, এমন উত্তেজনা। ওকে মারতে গিয়ে রক্তকণিকা কেমন ঝিকমিক করে উঠেছিল, তীব্র আগুনের হলকা নেমে এসেছিল চোখের তারায়, কেমন একটা পৈশাচিক উল্লাস অথচ ছেলেটাকে তিনিই কুড়িয়ে এনেছিলেন পরম আগ্রহভরে। ওর মা বলেছিল, গরীবের আবার লেখাপড়ার কপাল।

এই এক কথা। পণ্ডিত সগর্বে বলে এসেছিলেন, একটু কষ্ট কর ফল পাবে। দেখো তোমার ছেলে একটা কিছু হবে, হ্যাঁ বড় মানুষ। আমি পড়াব। আমি মাহমুদ পণ্ডিত, হ্যাঁ। ভাবতে ভাবতে বিকালের পড়ন্ত রোদ ঘরের ছায়াটা বড় করে তুলল আঙিনায়। কারবারী ছেলেটা দুপুরেই চলে গেছে হাটে, তার না ফেরা পর্যন্ত উনুনে পাতিল চড়বে না। পণ্ডিত কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছলেন হাতের পিঠ দিয়ে, নিচের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলেন দার্শনিকের মতো।

একটা লোক এসে একখন্ড কাগজ দিয়ে গেল— পেন্সিলে লেখা একখানা চিঠি।

হরফগুলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। বইয়ের স্তুপের উপর থেকে খুঁজে আনলেন চশমার খাপখানা। দৃষ্টি ঠিক করে গভীর মনোযোগে লেখাটা পড়তে লাগলেন ঃ

প্রণামান্তে নিবেদন এই যে, আমাদের অঞ্চলের প্রাইমারী ইস্কুলগুলি দিন দিন বন্ধ হইয়া যাইতেছে, ঘর নাই, ছাত্র নাই, শিক্ষক নাই। তবু এখনও যাহা কিছু আছে, শুনিতেছি আইন করিয়া সেগুলি চিরতরে বন্ধ করিয়া দেবার ব্যবস্থা হইতেছে। একে তো দেশে শিক্ষা বলিতে কিছু নাই, তাহার উপর প্রাইমারী ইস্কুলগুলিও বন্ধ করিয়া দিলে আমাদের দুর্দশার সীমা থাকিবে না, আপনি সুস্থচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। প্রতিবাদের জন্য এ অঞ্চলের শিক্ষকদিগকে নিয়া একটা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। আশা করি, আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। কিভাবে আমরা জয়যুক্ত হইতে পারি তাহা আলোচনা করিবার জন্য আগামী রবিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় আমরা কয়েকজন আপনার কাছে আসিতেছি। আশা করি, জরুরী কাজ থাকিলেও আপনি বাড়ি থাকিবেন। ইতি— বিনীত, প্রাণনাথ মণ্ডল।

পড়া শেষ হলে, পণ্ডিত আপন মনেই বিড়বিড় কর উঠলেন, থাকব না কেন? কার ভয়ে থাকব না? দেশটারে ছারখার করে ফেলছে স্বার্থান্বেষীর দল!

সে দলেরই একজন কাশেমালী চৌধুরী।

সেদিন পথে দেখা হয়েছিল, কী চামার লোকটা : মাথায় জিন্নাহ্ টুপি, বুকপকেটে সোনার শিকল লাগানো চকচকে ঘড়ি। চোরাবাজার করে লাল হয়ে গেছেন অথচ বাইরে এক নম্বর মহাত্মা। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগিরি করেছেন তিনি বৎসর যাবৎ; সবাই তাঁকে প্রেসিডেন্ট করবার জন্য উদগ্রীব হলেও তিনি নাকি প্রত্যেক বারেই সবিনয় হাস্যে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, কী চালাক লোকটা! এবার তিনি জেলাবোর্ড নির্বাচনে সদস্য হওয়ার জন্য দাঁড়াবেন, কারণ জনসেবাই তাঁর জীবনের ব্রত। গদীর জন্যে তিনি মোটেই লালায়িত নন, কেবল দশজনের চাপে পড়েই— কী, চালবাজ লোকটা।

সেদিনের কথাগুলো কানে বাজে।

কি পণ্ডিত মিঞা। শরীরটরীর ভালো তো?

এই কোন রকম। আপনি কেমন আছেন?

আরে মিঞা, আমরা কি আর ভালো থাকতে পারি? কথায় বলে, উপকারীকে বাঘে খায়।

কেন? কি হল?

এই দেখুন, গ্রামে একটা কারখানা করে দিলাম। ভাবলাম, গরীবেরা খেটেখুটে বাঁচুক। এতে অনেকে বলেছে, দেশটা নাকি উচ্ছন্নে চলেছে। লেখাপড়া ছেড়ে দুধের বাচ্চা পর্যন্ত কাজে নামছে। কিন্তু আমি বলি, খেয়ে বাঁচলে তো লেখাপড়া? কি বলেন?

তা'—কিছু বলতে পারলেন না মাহমুদ, গলার শব্দ আটকে আছে।

আরে মিঞা, আমরা সব বুঝি। আমরা সমাজের মাথা। উপর-ওয়ালার দৌলতে দুপয়সা হয়েছে। আমরা যদি মানুষের সুখদুঃখ না বুঝি তাহলে আর বুঝবে কে? কিন্তু এমনি দিন পড়েছে যে, ভাল কাজ কেউ দেখতে পারে না। মৌলবীরা বলে, দর্জালের আমল এসে গেছে। তাই ঠিক।

রবিবার সকালে বারান্দার রোদে বসে পণ্ডিত পৃথিবীর মানচিত্রটা নিবিষ্টমনে পর্যবেক্ষণ করছিলেন হরেকরকম রং আর সীমারেখায় আঙুল চালিয়ে, রুলারের ভাঁজে ছিঁড়ে গেছে মানচিত্রের কয়েক জায়গা। ছেঁড়া অংশগুলো তার চোখে পড়ল। সেগুলো জোড়া দেওয়ার জন্য কাফিলার আঠা আনতে উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চৌধুরীবাড়ির মুনি এসে চুপিচুপি যে খবরটা দিল, তা শূনে তিনি বাড়ি থেকে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন।

কাছে আসতেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

না, না। তিনি এগিয়ে গেলেন মাথাবাঁকানো লাঠিটা উঁচিয়ে। তাঁর শীর্ণদেহ উত্তেজনায় এমনভাবে কাঁপতে লাগলো যেন এক্ষুনি লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। বেশ আরামে শুকনো দুর্বা চিবোচ্ছিল স্বাস্থ্যবান বলদজোড়া, পণ্ডিত নতুন খুঁটিতে আঁটিয়ে-বাঁধা গেরো খুলতে গেলেন ভুতে পাওয়া মানুষের মতো।

কে, পণ্ডিত মিঞা নাকি? থাক্‌থাক্‌ আপনার কষ্ট করতে হবে না। চাদরটা কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে চৌধুরী এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। মুখ আর গোঁফের আড়ালে বাঁকা হাসি। পণ্ডিত প্রথমটায় কিছু বলতে পারলেন না, শুধু কটমট করে তাকালেন। ঘৃণা, ক্রোধ, জিঘাংসা তাঁর মুখে একসঙ্গে প্রকট হয়ে উঠল।

শয়তানির আর জায়গা পেলেন না? শেষ পর্যন্ত থাবা দিয়েছেন ইস্কুলঘরের উপর। দুনিয়া ঘোরে কোন তালে, টাকার গরমে বুঝতে পারেন না বুঝি?

সাবধান। মুখ সামলে কথা বলো। চোখ পাকিয়ে বললেন কাশেমালি চৌধুরী।

রাখ। তোমার ধমকানিতে কেউ ডরায় না। সরকারেরও সাধ্য নেই ইস্কুলঘরের ওপর হাত দেয়, আর তুমি কোনখানের জমিদার? ইস্কুলঘরে গরু—

দেখ্‌ পণ্ডিত। বেশী বাড়াবাড়ি করিস না। ভাষা ক্রমশ নীচে নামছে, ভদ্রতার আবরণ ছেড়ে।

তুই আবার বলবার কে রে? পণ্ডিতও ছাড়বার পাত্র নন বরং যেন এককাঠি উপরে।

দৃঢ়স্বরে বললেন কাশেমালি, এটা আমার জায়গা, আমার টাকার ঘর। আমি দেব না।

পণ্ডিত আর কোন জবাব না দিয়ে খুঁটির গেরো খুলতে লাগলেন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে।

খুলিস না। ক্ষিপ্ত চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন।

প্রথম দড়িটা হেচকা টানে খুলে বলদটাকে বার করে দিলেন ঠেলে, তারপর দ্বিতীয় খুঁটিতে হাত দিলেন পণ্ডিত।

কিন্তু দড়ি খোলা হল না। প্রথম একটা শব্দ, তারপর আর্তনাদ।

পণ্ডিতের উঠোন লোকে লোকারণ্য। যে ছোট ঘরখানা সবার দৃষ্টির সম্মুখে থেকেও আড়ালে ছিল একটি মাত্র ঘটনার সংঘাতে তা বিরাটভাবে সবার সম্মুখে ভেসে উঠল। গ্রামে এমন লোক কেউ নেই, যে ব্যাপারটা শোনেনি, পুকুরের পানিতে ঢিল ছুঁড়লে চঞ্চল ঢেউগুলো যেমন পারে এসে আঘাত করে, তেমনি এ ব্যাপারটা সকলের মনে আলোড়ন তুলল।

আমায় ছেড়ে দে। আমি উঠবো। দেখে নেব একবার। এক একবার চিৎকার করে ওঠেন বালিশ ভিজে গেছে রক্তে। বেলা বারোটা উৎরেছে। মোটা কালছিটে পাঞ্জাবী, খাটো ধুতিপরা তিনজন লোক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটা ছেলেকে দেখতে পেয়ে কি জিজ্ঞাসাবাদ করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মুহূর্তে তির্যক হয়ে উঠল চাউনি। কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে একসঙ্গে তিনজনেই ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে। একটা টুল আলগোছে টেনে নিয়ে শিয়রে বসল প্রাণনাথ মন্ডল, চৌকির একপাশ থেকে তুলে নিল বেতের পাখা। আগাগোড়া শোনার আগেই ব্যাপারটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। টুঁ শব্দটি না করে শুশ্রূষায় সাহায্য করতে লাগল।

সমস্ত দেহ নিঃসাড়। বুকটা শুধু ধুক্‌ধুক্ করছে।

বালতি থেকে একফালি শাদা কাপড় ভিজিয়ে পণ্ডিতের কপালটা ঠাণ্ডা রাখল প্রাণনাথ। আস্তে আস্তে কতক্ষণ বাতাস করল, আহত মানুষটি গভীর আয়েশে ঘুমিয়ে গেছে বলে মনে হল। যারা কাছে ছিল তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

সবাই একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর কোঁচকানো মুখের রেখায়।

একটু পর পণ্ডিত ধীরে ধীরে চোখ মেললেন বিহ্বলের মতো। আশে পাশে চেয়ে অজানিত ভয় পেয়ে যেন পর মুহূর্তে বুঁজলেন চোখের পাতা। স্মৃতি যেন লোপ পেয়ে গেছে। ঠোঁটজোড়া করুণভাবে কাঁপল একবার।

তুই এলি? এলি তুই শাহু—শাহজাদা? একটু একটু জোরেই ফিস্‌ফিস্ করে উঠলেন পণ্ডিত। দুটি হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি তোকে খুব মেরেছি, তাই নারে? কই এসেছিস তুই?

একজন বলল, এসেছে, এইতো আপনার শিয়রে।

আপনি চুপ করুন তো। প্রাণনাথ পাখাটা তুলে বাতাস করতে লাগল।

চোখ বুঁজেই আবার তিনি বিড়বিড় শুরু করলেন, আমি জানি তুই না এসে পারিস না। করিম, বজলু, সুজয়, শিশির তোরা আমার চোখের মণি, বুকের বল। আমি জানি তোরা না এসে পারিস না। আমি তোদের কত ভালবাসি।

কতক্ষণ চুপচাপ।

আরে তোদের তো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে রে। জাদুরা, ভাঙা ঘরে আর পড়াব না তোদের। দালান করব। সামনে থাকবে খেলার মাঠ, সবুজ ঘাস। তোরা হাসবি, খেলবি।

পণ্ডিত সাব? কাঁধে ঝাঁকানি দিল প্রাণনাথ।

কি রে কথা বলিস না কেন? তোদের মুখ যে মলিন। ও বুঝেছি, চৌধুরী শয়তানটার কথা ভেবে? মাঠে তোদের খেলতে দেবে না? দূর পাগলা? কি, বিশ্বাস করিস না আমাকে? তাহলে এই দেখ— রক্ত, রক্ত ওই বদমাশটারে আমি খুন করেছি। তোদের জন্য, খুন করেছি। একটা বুকভাঙা চিৎকার।

প্রাণনাথ কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল, দেখুন আমরা কারা এসেছি, শুনছেন? আমি প্রাণনাথ, চোখ মেলে চান।

কে? কে তুমি? বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন চেতনা ফিরে আসছে।

এই যে আমি। চিনতে পারছেন না? আমি মণ্ডল, প্রাণনাথ—

এরপর একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, সবকিছু বুঝবার চেষ্টা করছেন। আস্তে করে বললেন, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি—

আপনার কি হয়েছিল স্মরণ করুন। প্রাণনাথ বলল, আমরা সবাই আছি।

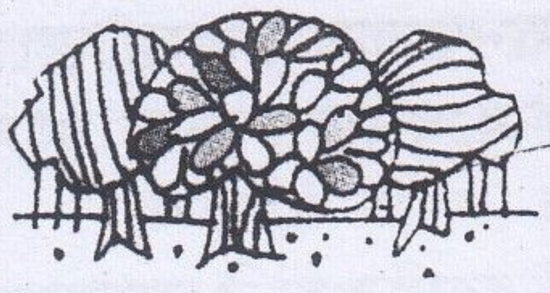
ও হ্যাঁ, ইস্কুলঘর, চৌধুরী, লাঠি। বলতে বলতে আশেপাশে প্রত্যেকের মুখের ওপরে বুলিয়ে নিলেন বিভ্রান্ত চাউনি।

সকালের ক্রমপ্রসারিত আলোর স্পর্শে গাছগাছড়ায় জটপাকানো অন্ধকার যেমন ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে, তেমনি বাস্তব চৈতন্যের উন্মেষে সবকিছু মনে পড়তে লাগল! এক গেলাস ঠান্ডা পানি পান করলেন, তারপর ফেললেন পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস।

কেমন লাগছে এখন? তাকে তুলে ধরে প্রাণনাথ জিগগেস করল।

কিছু ভেবো না, সব ঠিক আছে। গভীর শ্রদ্ধার সাথে শুশ্রূষারত প্রাণনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই হাসলেন একটু, তারপর বুকটা দেখিয়ে অদ্ভুত গলায় বললেন, কিন্তু এখানে বড় বেদনা? আমার বেদনা তোমাদের বেদনা হয়ে উঠুক এই আমি চাই। আর কিছু না, আর কিছু না।

আগষ্ট, ১৯৪৮।



মুখোমুখি

আগুন জ্বলছে, জ্বলতে থাকে আগুন। শুকনো খরখরে খড় ফট্‌ফট্‌ করে জ্বলতে জ্বলতে চারপাশ ফর্সা করে তোলে, আগুনকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে ওরা। অনেকগুলো এবড়ো-খেবড়ো মুখ। অধিকাংশের বয়েস সাতাশের এপার-ওপার। কেবল খুঁৎখুঁতে বুড়োটা অসম্ভব গোঁ ধরায় আর ফকির বাড়ির মুখচোরা ছোকরাদুটো পেছন পেছন জোঁকের মত লেগে থাকায় মেজাজের সঙ্গে মিশ না খেলেও আনতে হয়েছে এদের। আসবার সময়ে সারা পথে, এমন কি ধানকাটার হাউরে এসেও সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে কুলুনীর ছেলে শুকুরটা। একে নিয়ে আর পারাই গেল না, মাথায় শুধু গোবর। ওরা কেউ সঙ্গে আনতে চায়নি, কেবল কিপটে বুড়োটার মাতব্বরিতে না এনে পারা গেল না।

লাল আগুনের কাছটিতে ওরা বাড়িয়ে দেয় রুক্ষ আর জীর্ণ হাতগুলো, তীব্রমধুর তাপের আমেজে ভিতরে ভিতরে সজীব হয়ে উঠতে থাকে।

আগুনের চারপাশ দিয়ে মুখগুলো জাগে। কেবল এখানেই নয়, তরল অন্ধকারে সারামাঠ জুড়ে আগুনের পর আগুন। রাত ক্রমে বেড়েই চলে। এখনো কারো চোখে ঘুম নেমে আসেনি। খড়ের চালার নিচে স্তূপজমানো শুকনো ধানের ডাঁটার ওপর ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে শোওয়া নতুন করে ওদের শিখতে হবে না, আবার এরকম হাড়কাঁপানো শীতে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুঁজে পড়ে থাকার অভ্যেসও আছে। কিন্তু তবু ওরা গোল হয়ে বসেই রইল।

আজ আগুন এতো ভালো লাগছে যে বলতে নেই। লাল লাল ফুলকিগুলো শীতের আসমানের অনেক ওপরে উঠে চট্‌পট্‌ মিলিয়ে যায়। ঘাড় বাঁকিয়ে কেউ কেউ তামাশা দেখে। পাশ থেকে মুঠি মুঠি শুকনো খড় আগুনের মাঝে ছেড়ে দেয় একজন। ফুর্তির তোড়ে বলে উঠল, দ্যাহ, কী রহম পুড়ে। একটুও ধোঁয়া নাই।

ভারি মজা! পিছন থেকে বলল একজন।

ঠিক কইছস! রহিম বখশ সশব্দে কেশে ওঠে। খুস্‌খুস্‌ করে তার গলা। কাশির দমক থামতে চায় না। সারা শরীর ঝাঁকুনি খায় তালে তালে, বয়স হয়েছে অনেক আর এবার পৌষ মাসেই যা শীত পড়তে শুরু করেছে, জোয়ান লোকেরই রক্ত জমে যাওয়ার কথা. আবার ওপর হিমেল রাতের আকাশের নিচে খোলা প্রান্তর। শিখার ফাঁক দিয়ে সবার দৃষ্টি তার মুখের দিকে যায়।

মজিদ ঠাণ্ডাস্বরে বলল, চাচা, তোমার বাড়িৎ যাওন উচিত। শরিল ভালা মনে অয়না। এই সময় কাশিডা বেজায় খারাপ। বিছানায় পইড়া যাওয়াডাও তাজ্জবের কিছু না।

কি কইলি? কাশি থামিয়ে রহিম বখ্‌শ বলল, ভালা দিয়া কি করুমরে? অহন কি আর শাদি করার দিন আছে, না ফিট্‌ফাট্‌ চলার? ষাইট গেল, আর কত! ভাঙা নাও পানি তো দিবই।

আবার কাশির দমকে থক্‌থক্‌ কাঁপতে থাকে। কী আর করা যায়।

ডাবাডা কইরে? এক ছুলুম তামুকই দেস না! মধু এতক্ষণে কাজের মতো কথা বলল, গলাডা পিত্‌পিত্‌ করতাছে। উহ্‌ কী জার রে বাবা!

মরুনের পালা আর কি! মজিদ আরো কাছে ঘেঁষে কথাটা সমর্থন করল যদিও তার

শরীরে জোয়ানি কম নয়। বিদেশ বিভুঁইয়ে কাজ করতে এমন অনেক রাত সে কাটিয়েছে, তার যে-কোন কথা শোনবার মতো। রহিম বখশ পিট্‌পিট্‌ করে কতক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর গলায় ঠাট এনে বলল, মরুম ক্যারে?

না মরলে এহানে আইলাম ক্যারে? মজিদের দাঁতগুলো বিশ্রি রকমের বড়ো, তার কথা বলার ভঙ্গিও সহজেই চোখে পড়ে, ঘর নাই? বাড়ি নাই? কেঁথার তলায় নাক ডাহাইয়া ঘুমাইতে পারতাম না? বাড়িতে বউ আছে, বাচ্চা-কাচ্চা আছে। আর এহানে অসুখ অইয়া পইড়া থাকলে কেডা দেখব? মরতে কতক্ষণ।

গুড়গুড়িটায় দম কষে একটা টান দেয়ার পর ফোঁস করে ধোঁয়া ছেড়ে মধু রসিকতা করল, পেটটা না থাকলেই চলত। এহানে আর আওন লাগত না। বৌয়ের গলায় মালা দিয়া সামনে নিয়া বইসা থাকতাম অষ্টপহর। গলা ছাইড়া দারুণ পীরিতির গান গাইতাম পরানের জ্বালায়।

লও পেটটা কাইটা ফালাইয়া দেই। মজিদ আরেক দাগ উপরে উঠল, তা অইলে আর খাওনের লাইগা ভাবুন লাগব না। তোমরা কি কও?

ভালা কথাই তো কইছস। রহিম বখশ বলল, পেট কাডন লাগব না রে। কয়ডা দিন সবুর কর।

বাইরে আর কতক্ষণ থাকা যায়? ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস বইতে শুরু করেছে, যেন কোন বিরহীর নিদারুণ আলাপ। মাঠজোড়া ধানশিষের হিসহিসানি কানের পর্দায় কাঁপুনি তোলে আর তাতে একটা ব্যথায়িত মৌনতায় মনের তারগুলো একসঙ্গে টুংটুং করে বাজে। আকাশের তারারা মিটমিট করে এদের প্রাখর্যের অসামর্থ্য জানায় আর শুকতারা মাথার ওপর দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে তার আভিজাত্য ঘোষণা করে।

মাঠের চারপাশের আগুন একেকটা করে নিভছে, তবু লাল অঙ্গার জ্বলে অনেকক্ষণ। খড়ের চালাঘরে শুয়ে থাকলে এই জবা ফুলের মতো লাল অঙ্গার দেখতে দেখতে ঘুম আসে। এতক্ষণে অনেকের চোখ ঢুলুঢুলু। আধ-অচেতন অবস্থায় হঠাৎ ঢিব খায় কেউ কেউ।

লও, ঘুমাইগা। কা'র তন্দ্রা জড়ানো স্বর।

গরিবের আবার ঘুম, আমরা তো খালি চোখ বুনজি। মাঝে মাঝে এ ধরনের কথা বলতে মজিদ বেশ আমোদ পায়। কথা শুনে ওরা হাসলেও সে গম্ভীর হয়ে থাকে।

বেশি রাত জাগলে ভুখ লাগে। চোখ কচলিয়ে হৈ হৈ করে উঠল রহিম বখশ, আজ বেশি খাইতে পারি নাই। যা খাওয়া দেয়। আধা খুদ আর আধা চাইলের জাউ। দেখলেই দিলডা ফিইরা যায়। মনে লয়, লাথি মাইরা ফালাইয়া দেই। মধু চালার ভিতর গিয়ে বলল, আর কত আগুন তাপাও? আগুন নিইবা গেছে গা।

নিইবা গেছেগা? রহিম বখশ বেকুপের মতো হেসে উঠল, বলল, নিবলে আর কি অইব? একটু ফুঁ দিলেই জ্বইলা উঠব আবার। কি কস্‌রে তোরা? হে হে হে হে।

যারা বাইরে ছিল একসঙ্গে হাসিতে যোগ দিল।

ভারি তো ফুর্তি লাগে তোমরার? শুকুরও কথা বলতে জানে। একটা মরামানুষ যেন জেগে উঠল হঠাৎ। সারাদিনেও দু'তিনটের বেশি কথা বলে না, কিন্তু সময় সময় এমন কিছু বলে ফেলে যা সবাইকে ভাবিয়ে তোলে রীতিমত।

মজিদ উচ্চহাস্য করে উঠল, ক্যারে কী অইছে রে?

কী অইছে আবার কও। শুকুর ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, তলে তলে একটা কতা হুনতাছি।

কতা যহন উড়ে তহন তা বেঠিক অয় না।

কি কতারে? ওকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই।

ও বলতে লাগল, হুনতাছি এবার আমরারে ধান নিতে দিব না। ধানের বদলা একটা কাগজের ছিলিপ দিব। নিজেরার জিলাত গিয়া কাগজের লম্বর দেহাইয়া গুদাম থে ধান লওন লাগব। আর যারা টেহা নিতে রাজি তাদের টেহা দিয়া বিদায় কইরা দিব।

টেহা নিয়া আমরা কি করুম। প্রায় একসঙ্গে সবার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সবগুলো মন যেন দপ্ করে নিভে গেছে। কেউ বিশ্বাস করল না কথাটা, আমল দিতে চাইল না। নির্মম হয়ে জেরা করতে লাগল, তুই হুনলি কই? কই হুনলি?

মজিদ তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠল, আরে বাদ দে। গরুর আবার একটা কতা।

বিশ্বাস করো আর না করো, আমার কী। আমি হুনলাম তাই কইলাম। আমার কী?

ইস ভারি একটা কতা। রহিম বখ্শ গর্বিতকণ্ঠে জোরে জোরে বলতে লাগল, দেখুম নে কোন হালা ধান নিতে না দেয়, খেলা আর কি! ধান কাটলাম এত কষ্ট কইরা আর নিতে দিবে না হুঁ। মগের মুল্লুক পাইছে নাকি? বেশি তেরিমেরি করলে দেহাইয়া দিয়াম, হুঁ।

কথাটাকে মোটেই আমল দিল না কেউ। তবু অনেককে ভাবিয়ে তুলল। চাপা গরগর করে কাঁথার নিচে ডুবে গেল ওরা। সবাই যেন হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে উঠেছে।

আমরা ক্ষুধিত। আমরা খেতে চাই। আমরা খাব। সারা দেশটা গুমরে গুমরে চিৎকার করে।

তারপর আবার খাপছাড়া আশায় বুক দুলে ওঠে, পৌষ এসেছে ধানের মৌসুম। ছেঁড়া কাঁথাগুলো পুটলি-মত বেঁধে গামছার আগায় ঠেকায়, পুরনো কাস্তের জং ফেলে গুঁজে রাখে পুটলির ভিতরে। লাঠি কাঁধে ফেলে দলে দলে বেরিয়ে যায়। নদী পার হয়ে চলে তা'রা, পাটালি গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ের ঝাঁক যেমন কিলবিল করে ছোটে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বড়ো বড়ো হাউরগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শোনা গেছে, ধানে ধানে এবার সব খেত ঢলে আছে। এবার সময়মত হয়েছিলো বৃষ্টি, তার ওপর গতবারের বর্ষায় পাহাড়ের ঘোলাপানি না নামাতে উর্বর অঞ্চল থেকে পলিমাটি এসেছে বেশি।

রোজ দু'বেলা পেটভরে খেতে পেয়েও কাটা-ধানের তিন ভাগের একভাগ মজুরি মেলে। কম হয় না রুজি। চোখকান বুঁজে খাটতে পারলে বাচ্চামুনিও মাস দুয়েকের খোরাকি আনতে পারে।

সকাল হবার আগেই মানুষগুলো জেগে ওঠে অভ্যাস মত। আগুন জ্বেলে হাত-পা কিছুটা শক্ত করে নিয়ে গুড়গুড় শব্দে তামাক কায়, খড়ের ভিতর থেকে টেনে নেয় কাস্তেগুলো হাতের আন্দাজে, তারপর মাঠজোড়া ধানকাটার ঘস্ঘস্ আওয়াজ। বেশ কুয়াশা পড়েছে। কিছুক্ষণ ধান কাটলেই শরীরের হিহি ভাবটা কেটে গিয়ে গরম রক্ত চলে শিরায় শিরায়। শীত থাকতে পারে না।

ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে। মশারির মতো কুয়াশা ছিঁড়ে শিশিরভেজা পাকা ধানশিষের ওপর ঝল্ঝল্ করে রাঙা আলো। তাপের হঠাৎ তীব্রতা ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া চামড়ায় সুখস্পর্শ জাগায়। গা বাড়িয়ে দেয় ওরা। প্রতিটা লোমকূপ সূর্যের কিরণ পান করে সজীব হয়ে ওঠে। খাড়া লোমগুলো চামড়ার সাথে মেশে ধীরে ধীরে। সূর্য আরো কিছু উপরে উঠলে কুয়াশা কমে যাবে অনেকটা, তখন প্রান্তরজোড়া সারি সারি কাস্তে চালানো লোকগুলোকে ডানা জাপটানো শকুনের মত মনে হয়। এতক্ষণে বাড়িগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রায় আধ মাইল দূরে দূরে মাটির টিলার ওপর একেকটা বাড়ি, হয়তো তিনচারটে করে ছনের ঘর।

ফলমূলের গাছ বিশেষ নেই। কেবল চারপাশ দিয়ে পাতা উঁড়িয়ে থাকা কলাগাছ নজরে পড়ে। আজকাল মেয়েরা বেশির ভাগ সময়ই মাঠে কাটায়। পোড়ো ধান কুড়োয়। কারণ এ মাঠের আসল ধানে অনেকের হাত দেবার যো নেই।

প্রথম দৃষ্টিতেই যা চোখে পড়ে সে হল একটা বড়ো বাড়ি।

উত্তর দিকে একটি আর দক্ষিণে অন্য একটি একতলা দালান। সামনে তিন গম্বুজগুলো সুন্দর মসজিদ। নতুন চুনকাম করা হচ্ছে এবার। একটা মিনারের কাজ চলছে। জোতদারের বাড়ি। বলতে গেলে তিনিই এই হাউরের সব জমিজমার একচেটে মালিক। পরহেজগার আর ঈমানদার লোক হিসেবে এই অঞ্চলে পরিচিত। তাঁর কথায় ওঠে বসে সমগ্র বানিয়ারচং।

হজ করে এসেছেন এবার। সংসারের টানাপোড়েন থেকে বিদায় নিয়েছেন তাই। সারাদিন কোরান-কিতাব তেলাওয়াত করা, জায়নামাজের ওপর বসে চোখ বুঁজে থাকাই হল তাঁর একমাত্র কাজ। বড় ছেলের ওপর সমস্ত বিষয়-আশয় দেখবার ভার। কিন্তু আদতে পুরনো গোমস্তার হাতেই সবকিছু। মাঠের অর্ধেকের চেয়ে বেশি জমিই খোদ খামারের অন্তর্ভুক্ত আর বাদ বাকি আধি বর্গা কিষাণদের মধ্যে ছড়ানো। বর্গা না দিয়ে কি আর করা যায়, গরিবরাও নেড়েচেড়ে বাঁচুক।

শুকুরের মুখে কথাটা শোনা অবধি রহিম বখ্‌শের পেট কামড়ানি উঠেছে। মাঠের অনেক দূর হেঁটে জনমজুরদের কাছে বলে বেড়ালো তামাক খাওয়ার অছিলায়, বলল অনেকের কাছে। বিষয়টা শুনল সবাই। কেউ কেউ গায়ে মাখল, কিন্তু অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিল।

আচ্ছা মিঞা। তুমি তো কইলা গরিবরা বড়লোকের সঙ্গে পারব না? রহিম বখ্‌শ মোটামুটি নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছে। এতদিন চোখের ওপরে যা দেখে এসেছে, জানে সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে জিনিশ সত্য দেখতে শিখলে সবার কাছে তা সত্য বলেই ঠেকবে এই তার বিশ্বাস।

অচেনা লোকটি একটা বড়ো ধানের মুঠি ধুপ্ করে উড়িয়ে ফেলল একটু দূরে, সে দুইকানি জমির বর্গাচাষী। আরেক মুঠি ধানের গোড়ায় কাস্তে চালিয়ে বলল, হ, তাইতো কইলাম।

আইচ্ছা, দেশে গরিবলোক বেশি, না বড়লোক?

গরিবইতো বেশি মনে অয়। জওয়াবটা ঔদাসীন্য ভরা।

রহিম বখ্‌শ যুক্তি দেখাতে চায়, বলল, তা যদি অয়, গরিবরা এক অইলে বড়লোক হালারা কয়দিন টিকব? শুকনা পাতার মতন উইড়া যাইব না? হালা ডাকাতের দল।

গরিবরা মিলে আর কই? এইবার লোকটা মনোযোগ দিয়ে কথা বলল, এবার মধ্যি যতসব বেইমানি। দশজন রুইখা দাঁড়াইলে আর নয়জন গিয়া বড়লোকের পা চাটব। সবাই এক অইলে জমিন দখল করতে, ঘরে ফসল আনতে কতক্ষণ লাগে? এই দেহ, আমি আধি করি। সারা বছর গতর খাইটা তিন মাসের ভাতও পাই না, ওদিক দিয়া ঘরে লেপ তোষকে ঘুমাইয়া জোতদার বেডারা আধা ধান নিয়া যায়। এসব সহ্য অয় কয়দিন?

এই দেহ, ব্যাডা মাইনষের কতাই তো এই রকম। আর কতকাল সইয়া থাকুম? এরা যা মনে লয় তা করব। আর আমরা মরবাম? ইস্, খেলা আর কি? রহিম বখ্‌শ গুড়গুড়িতে কষে টান দিল একটা, নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে হিসহিসিয়ে বেরিয়ে গেল ধোঁয়া। মাথায় একটা শাদা চাদর পাগড়ি মতো বাঁধা, খয়েরি রঙের ছোপ মারা খাটো পাঞ্জাবী গায়ে থপ্‌থপ্ পা

ফেলে গোমস্তা এসে দাঁড়াল স্তূপ জমানো ধানের আঁটির কাছে, ঠোঁট ফোলা মুখে উচ্চহাস্য করে বলে উঠল, কী মিঞারা! অহনো শেষ করতে পারলা না। দশদিন অইয়া গেল। আরও কত সময় নিবা, হ্যা?

ঘাড় বাঁকিয়ে একটু চেয়ে আবার কাজে মনোযোগ দিল ওরা।

সে খবরটা সবার মনেই কাঁটা দিয়ে রয়েছে, কিন্তু কেউ জানাতে পারছে না। শুকুর পিট্‌পিট্ করে গোমস্তার মুখটা দেখে নাক ছিটকাল, বেশি কথা বলা অভ্যাস নয় তার। কথা বলবার জন্যে রহিম বখ্‌শের ঠোঁট চুল্‌বুল্ করছিল, কাস্তেটা ধানের মুঠিতে গুঁজে তামাক সাজতে গেল।

নেন। তামুক খান্। তমিজ দেখাল রহিম বখ্‌শ।

খাও মিঞা তুমি খাও। আমি খাইয়া আইছি এই মাত্তর।

রহিম বখ্‌শ হুঁকোর ছিদ্র থেকে মুখ উঠিয়ে হঠাৎ বলে উঠল একটা কতা হুনলাম গোমস্তা সাব। এইডা কি ঠিক?

কি কতা? গোমস্তার গলার স্বর স্বভাবতই একটু কর্কশ।

এবার নাহি ধান নিতে দিবেন না?

ও এই কতা। গোমস্তা বিকটভাবে হেসে উঠল, বাজে জিনিস নিয়া মাথা ঘামাইও না। পিইটা কাম কর মিঞা, পিইটা কাম কর।

ফুর্তির দমকে হুঁকোটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। বুড়ো রহিম বখ্‌শের শিরায় শিরায় একটা নিদারুণ ঘৃণার রেশ শিরশিরিয়ে যায়, খ্‌কখ্‌ক করে কেশে উঠে শুকনো ডাঁটার ওপর থুথু ফেলল অবজ্ঞায়।

আবার নামে রাত। শাদা বাড়িটার দিকে থেকে ভেসে আসে কলের গানের মিহিন আওয়াজ। চিনচিনে, রিনরিণে সুর। বাড়িতে মস্‌জিদ, মিনারও উঠেছে। বিশেষত এমন এক পরহেজগার লোকের বাড়ি। এতে কি আসে যায়? যে ঘরে করে গান বাজছে সেটা মসজিদ থেকে অন্তত একশো হাত দূরে, তার ওপর সেটা বাতাসের উলটোদিক। মসজিদের গায়ে বাতাস না লাগলেই হল। ছোট সা'বকে নতুন বিয়ে করানো হয়েছে, এ বয়সে অনেকেই করে অনেক কিছু, এতসব ধরে কি আর পারা যায়।

তারা গোল হয়ে বসে। আরো বড়ো বড়ো আগুন করে ফর্সা করে তোলে সারামাঠ আর অনর্থকই হৈ চৈ করে ওঠে। আগামী কাল আধরোজ কাজ করলেই শেষ ধানকাটা, তারপর শুরু হবে মাড়াই। বিশেষ সময় নেই। কর্মের শেষে যে অনির্বচনীয় আনন্দ, তা আর অন্তর মন ছাপিয়ে উঠছে না ; বদলে একটা ভয়, একটা আশঙ্কা দানা বেঁধে ওঠে।

দেখমু, কোন্ হালা ধান আটকায়।

হ, অহন তো খুব বড়ো বড়ো কতা কও। কাজের বেলায় থাকব না কিছু।

কি অইলি তুই? রহিম বখশ রেগে গেল, আচ্ছা দেহিস তোরা। অহন আর কিছু কইলাম না। যতখন জান থাকব এ রহিম হটব না। এ করিম বখ্‌শের পুত ভুলিস না হেই কতা।

তার কথায় হাসল কেউ কেউ।

পরদিন দুপুরের আগেই সারা মাঠের ধান-কাটা শেষ, দশ বারোটা গরুগাড়ি এঁটেল মাঠির ওপর খরখর শব্দে ঘুরে ঘুরে বাঁধা মুড়িগুলো নিয়ে গেল শাদা বাড়িটার সামনের বড়ো উঠোনে। এমন এক সময় ছিল যেখানে ধানকাটা হত সেই খেতেই চলত মাড়াই কাজ। দিনকাল বদলেছে। আজকাল বাপ ছেলেকেই বিশ্বাস করে না, জন মজুরের কথা তো অবান্তর। ধারিয়াল ধানের মোটা মোটা ছড়া মাড়ার ওপর থেকে হেলে পড়ে থাকে, ভিতরের

পুষ্ট চাল পুট্‌পুট্‌ করে। প্রতিটা ছড়া এক একটা আশ্বাস, জীবনের এক একটা সত্য। ক্ষুধার্ত চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে, দেখে দেখে যেন তৃপ্তি হয় না। নাড়ার টালের উপর বসে ওরা হাঁপায়। শরীরে ছিটে পড়ে সোনালি ধান।

বর্গা-চাষীদের ধান মাড়াইর আলাদা উঠোন। মসজিদের পাশাপাশি গোলাঘর। চারপাশ দিয়ে ইটের পাঁচিল উঁচু হয়ে টিনের চালে মিশেছে, আলো আর বাতাসের জন্য দু'পাশে রাখা খোপরদু'টো যেন গোরা সৈন্যের লোহার টুপির নিচে দু'টো কানের ছিদ্র। নতুন টিনের চাল ঝিক্‌ঝিক্‌ করচে সূর্যের আলোয়। দুই উঠোনে প্রায় দুইশত লোক।

একটাল নাড়ার ওপর শুকুর মাথা গুঁজে বসেছিল, কতক্ষণ পর সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বাকি লোকজন ধান ছাড়াচ্ছে, তাদের শরীর বেয়ে ঝির্‌ঝির্‌ করে ঝরছে ঘাম। মসজিদের বারান্দা থেকে গোমস্তার ধমক এল, 'এই বেডা, বইসা বইসা, কী করিস? ছুতানাতায় ফাঁকি দিলে চলব না গো। আমরা এর দাওয়াই জানি। ভালা দাওয়াই জানি।

রহি বখ্‌শ গামছা ঝেড়ে ওর কাছে এল। জিগ্‌গেস করল, কিরে কান্দিস কেন? কী অইছে তোর?

মা'য়ের কতা মনে পড়তাছে। হুঁ, হুঁ, হুঁ। চাপা ঠোঁটে কোনমতে কথাগুলো উচ্চারণ করে ও হাউমাউ করে উঠল। বুড়ো তো হেসেই খুন। আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আরে বেক্কল। এর লাইগা কান্দে নাহি কেউ? কাম তো শেষ অইয়া গেছে।

এইবার বাড়ির দিকে পা চালাইমু ফুর্তি কইরা। উঠ্‌ উঠ, এক্কেবারে ছেলেমানুষ। যা, মুখ ধুইয়া আয় তো।

শাদি করাইলে এতদিনে তিরিশ আত ঘর ভরত ঝিপোলায়। মধু টেনে টেনে বলল, অহনো মা'য়ের লাইগা কান্দা আইয়ে। যা মেঘনায় ডুইবা মর গা।

একটা আস্তা বলদা। মজিদ বলল, মাইট্যা কইলজাডা বহুৎ ডাঙর।

হাউজ থেকে যত্ন করে ওর মুখ ধুইয়ে আনল রহিম বখ্‌শ। এক মা ছাড়া কেউ নেই। গোবর ফেলা, উঠোন ঝাড় দেওয়া, আনাজ কোটা, গেরস্ত বাড়ির আরো টুংটাং কাজ করে একে অতটুকুন করে তুলেছে। মায়ের কথা না শুনে খুব উৎসাহভরেই এসেছিল ও, কিন্তু ওর মন আর কিছুতেই টিকছে না। উপদেশ দিয়ে আদর করে রহিম বখ্‌শ ওকে চাঙা করে তুলল। পরিশেষে শুকুর ছেলেমানুষি করে বলে উঠল, যদি ধান নিতে না দেয়, বাড়ি যাইব কি নিয়া?

আরে পাগল। রহিম বখশ হো হো করে হেসে উঠল, এ ভাবনা করিস কেন? ধান নিতে দিব না আবার কোন্‌ হালা? ধান না দিলে খাইয়াম কী? আমরা না খাইয়া মরুম্‌? হুঁ, খেলা আর কি।

আরো দু'দিন কেটে গেল। বৈঠকখানাটা অনেকগুলো বিক্ষুব্ধস্বরে গম্‌গম্‌ করছে। নদীর বাঁক যেমন কল্‌কল্‌ করে ঝড়ের দোলায়, তেমনি একটা অসংলগ্ন আন্দোলন। কোমরে শক্ত করে গামছাটা বেঁধে মধু লাফ ছেড়ে উঠল, 'যাইবার আগে দেইখা নিমু এক আত্‌।

হ দেইখা নিমু। সবার কণ্ঠে একই আওয়াজ।

রহিম বখ্‌শ একপাশে গুম হয়ে বসে। তার মুখে কোন কথা নেই।

কিছুক্ষণ পর গোমস্তা ঘরে ঢুকল, সখিসখি ভাব। কর্কশ গলাটা ঝাড়া দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'কি করব মিঞারা। আমরার তো কোন হাত নাই? সব উপরওয়ালার মর্জির উপর। আমরা কি চাই না, তোমরা ধান নিয়া যাও? তবু দিতে পারলাম আর কই? কি জমানা পড়ছেরে ভাই, সবকিছু উলটাপালটা অইয়া গেছে। কি করতে পারি কও।

এ সব হুনতে চাই না। চেঁচিয়ে উঠল একজন।

হুনবা না? গোমস্তা ভেংচি দিল, বলল, অহন হুনবা কেন? লাডির গুতা খাইলে ভালা লাগব। বেশি খাইতে চাইলে থোড়াও পাইব না। অহন কিছু মজুরি দিবার বিবেচনা অইতাছে, পরে তাও হারাইবা। এ খেলা নয়, আইন।

মানি না এই আইন। একটা একরোখা কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ রহিম বখ্‌শ গা ছাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তামাক ও টিকের চোঙা আর নারকেলের ডাবাটা হাতে নিয়ে বাইরে চলে এল। চেয়ে দেখল, সমস্ত প্রান্তর আবছায়া আঁধারের নিচে গুটি মেরে আছে। আগুন বেশি নেই। সারা মাঠে দু'টি অথবা তিনটি আগুন। ঝিরঝিরে বাতাসে সারা প্রান্তর বেহালার মতো করুণ সুরে বাজছে। টিপে টিপে এক ছিলিম তামাক সেজে গুড়গুড় টানতে থাকে। ও ঘরের ভেতরকার কেউ জানতে পারেনি।

আগুনের কাছ থেকে কার গলার সুর কানে এসে বাজল ও সখি ঘরে আমার সোনার ফসল আর তো ভাবনা নাই। রহিম বখ্‌শ আপন মনেই হাসল একটু। ঠিকই তো সোনার ফসল হয়েছে এবার। নয়া ধানশিষের অভিযানে সারা মাঠ কেঁপে কেঁপে উঠছিল, কিশোরীর প্রথম যৌবনে সারা অঙ্গে যেমন এমন অপূর্ব শিহরণ জাগে। তারপর ধীরে ধীরে সূর্য এই শাদা শিষগুলোয় তার কিরণের তুলির টানে টানে সোনালি রং বুলিয়ে দিল। প্রতিটা ধানের বুক ভরে দিল দানায়। স্নেহের কার্পণ্য নেই! আয়োজনে নেই শিথিলতা। এই ধান ঘরে ঘরে দিতে পারে আনন্দ, মুখে মুখে ফোটাতে পারে হাসি, চোখে ঔজ্জ্বল্য আর বুকে বুকে গান। অথচ এ ধানের নাগাল কেউ পায় না।

কড়া তামাকের ধোঁয়ার মাদকতায় সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে, আর সমগ্র মন একাগ্র হয়ে শুধু একটি ইচ্ছায় গর্জে ওঠে। ছোটবেলায় বাজি রেখে খেলায় জিতবার শেষ চেষ্টার মতোই বেপরোয়া, একগুঁয়ে! রহিম বখ্‌শ ভিতরে ভিতরে ভয়ংকর হয়ে উঠল। পাশের খড়ে খস্‌খস্‌ আওয়াজ হয়। না চেয়েই জিগ্‌গেস করল, কে রে?

উহুঁহুঁ, আমি। উহুঁহুঁ। শুকুর বসল খড়ের ওপর।

কান্দিস্‌ ক্যান্‌ আবার? কান্দিস ক্যান্‌?

আবার কও কান্দিস্‌ ক্যান? কান্দুম না?

বুড়ো আর কোন কথাই বলে না। উত্তর আকাশ থেকে বড় একটা উল্কা ছিটকে পড়ে, অসীম ওপর থেকে কিছুদূর নেমেই মিলিয়ে যায়। তারাগুলো আজকে যেন পাল্লা দিয়ে জ্বলছে, এতো উজ্জ্বল আর প্রাণচঞ্চল আগে দেখা যায়নি। একটি তারায় এসে ওর চোখ থেমে যায়। আরো উজ্জ্বল, আরো, বড়ো, আরো জীবন্ত। একে বলে ধ্রুবতারা। কেমন হাসছে একটা নিটোল মহিমায়, সৌন্দর্য আর পূর্ণতায়।

ও ভাবে, মানুষের জীবন আর যৌবন কত সংকীর্ণ অথচ কত বিচিত্র। ফিরে চাইবার অবসর নেই। দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় ভোজবাজীর মতো, সলিতা পুড়ে যখন হাতে এসে লাগে তখনই চট করে হুঁশ হয় একদিন। মনে পড়ে একটা লোকগীতিতে আছে, যৈবন কচু পাতার উপর এক ফোঁটা টলটলে পানি, একটু নাড়া লাগলেই ঝরে যায়। উপমাটা মনে পড়তে আপন মনেই হেসে উঠল রহিম বখ্‌শ, মনের ভিতর গানের কলি ঘূর্ণী হাওয়ার মতো ঘোরে। চোখের সামনে দিয়েই সব কিছু ভেঙে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে, অথচ জীবনের কতটুকু মধু চাখতে পাওয়া যায়? কে এসেছিল জীবনে প্রথম তার মুখখানা ঠিক স্মরণে নেই, তবু ও যে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারেনি একথা ঠিক। কী করুণ ব্যর্থতা!

মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। আজগুবি ভাবনাগুলো এ সময় ফোয়ারার মত কলকলিয়ে

উঠছে কেন?

কি করব? রহিম বখ্‌শ ফিস্‌ফিস্‌ করল ঠোঁটে।

লও সবগুলোরে শেষ কইরা দেই। শুকুর ফুঁপিয়ে উঠল।

কী? হঠাৎ যেন একটু ধমকে ওঠে রহিম বখ্‌শ।

কী আবার? উহুঁহুঁ, যেন কিছুই বুঝে না। ওর কাছে সমস্যার সমাধানটা যেন নিতান্তই সহজ, এমন ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, আমার কাছে একটা কাগজ আছে। একবার নারাণপুর হাটে এইগুলি কারা বিলি করছিল।

কই, আন তো, দেহি।

তুমি পড়তা জানো? আনলে কি অইব?

আমি না জানি তাতে অইলো কী? রহিম বখশ খিট্‌খিট্‌ করে উঠল, বলল, মধু তো ভালারহম পুঁথি পড়তে জানে আর এই কাগজটা পড়তে পারব না?

হৈচৈ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। অনেকগুলো মুখর আর বিক্ষুব্ধ মানুষ। কোলাহলে, কথায়, সমালোচনায়। ভড়কে গিয়ে যারা কম টাকা নেওয়ারই মত প্রকাশ করেছে তীব্র শ্লেষে আর ধমকানিতে অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাদের। এভাবে এখান থেকে চলে যাবে না, অনেকের মনেই এই সংকল্প। কিন্তু তারপর কী করা যায়। হাত-পা ছুঁড়ে কী এক অসহ্য অনুভূতিতে, উত্তেজনায়। সবাই বসল ধান মাড়াই-এর উঠোনে, এখানে সেখানে ইতস্তত ছড়ানো খড়ের ওপর। বারান্দায় দাঁড়ায়ে মিঠেকড়া বিড়ি টানতে টানতে মোচে পাক দিচ্ছে বাঁধা করে আনা লেঠেলদের সর্দার, গোমস্তা আবছা অন্ধকারে নাক ডুবিয়ে একপাশ থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। বড়ো বড়ো সকড়ি নিয়ে চারপাশে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করছে কয়েকটা ছোকরা লেঠেল।

দেখ চিন্তা কইরা কি করবা।

কী দেহুম আর?

ঝিরঝিরে বাতাসে শীতের স্পর্শ।

একমুঠি খড় জড়ো করে আগুন দিলে মজিদ। ঘিরে বসল কয়েকজন।

মধু কইরে? আগুনের কাছে এল রহিম বখশ।

কী? মধু নাক বাড়িয়ে দিল।

এদিকে আয় একটু। গলার স্বরটা অর্থবোধকে।

মধুর সঙ্গে আরো কয়েকজন এল। একটু কৌতুহলের সঞ্চয় হয়েছে ওদের মনে।

পুরনো গামছার গাট খুলে বের করে দিল একখণ্ড গুটানো কাগজ, বহু যত্ন করে বাঁধা ছিল। শুকুর পড়তে জানে না, তবু হাট থেকে কাগজটা আনা অবধি শেখ বাড়ির মুন্সিকে দিয়ে কতবার পড়িয়ে শুনেছে। ভালো ভালো কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে তার। কথাগুলো কেমন সহজ, চোখা চোখা। খুব ভাল লাগে। এমন কথা এর আগে কোনদিন কাউকে বলতে শোনেনি। ভিড় ঠেলে কত কষ্টে এনেছিল কাগজখানা, পড়তে না জানলেও কত রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে খুলে দেখেছে কুপির লালচে আলোয়, কালো কালিতে ছাপা হরফগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেছে। পৃথিবীতে এ যেন তার এক গর্বের জিনিশ, গৌরবের বস্তু। এ ছোট কাগজের টুকরো তার কাছে নতুন জীবনের সংবাদ এনে দিয়েছে।

কাগজের টুকরোখানা হাতে নিয়ে মধু জিগ্‌গেস করল, কী এইড্যা?

রহিম বখ্‌শ বলল, পড় তো হুনি, ওটাতে কী লেহা?

কী লেহা? কাগজটা খুলে মধু আগুনের সামনে ধরল।

শুকুর কিছুটা উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, কী লেহা আছে আমি কইতে পারি। আমার মনে আছে।

রাখ্ পড় ক হুনি। রহিম বখ্শ ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

চোখ ছোট করে চেয়ে থাকে, আবার চোখ বুলোয়। চারপাশে যারা ছিল, তারা ঝুঁকে পড়েছে কাগজটায় দিকে, যারা একটু দূরে ছিল এল কাছে। নিজে নিজে মধু পড়ল দুইবার।

হুনাইয়া পড় না? রহিম বখ্শ অসহিষ্ণু।

রাহ্ পড়তাছি। সব হরফ কি আর মনে আছে?

মধু থক্থক্ করে পড়তে থাকে। কিছুদূর এসেই থমকে যায়, ঠোঁটে বিড়বিড় বানান করে শব্দটা, কোনমতে উচ্চারণ করে আরেক লাইনে এসে পড়ে। ওরা স্থির কান পেতে শোনে। একেকটা কথা কানের পর্দা ছিঁড়ে এসে বিঁধে তীরের ফলার মত। চোখের সামনে কাগজের টুকরোটা কাঁপতে থাকে।

পড়া শেষ হওয়া পর কাগজখানা গুটিয়ে শকুর বেঁধে রাখল গামছায়। তারপর ওরা গোল হয়ে বসল। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। কাগজের কথাগুলো ঝাঁক বেঁধে কানের পর্দায় বাজছে।

আগুণের দিকে কেউ মনোযোগ না দেয়ায় ধীর ধীরে নিভে গেল।

আঁধার গভীর নয়। তারাগুলো জ্বলছে।

ফিসফিসিয়ে কী বলাবলি করছে ওরা। রাত বেড়েই চলেছে। শীতও কম নয়।

তোমর মত আছে? চাপাস্বরে জিগগেস করে রহিম বখ্শ।

আছে। মধু জওয়াব দেয়, আর কোন পথ নাই।

ব্যাপারটা কিন্তু খুবই বিরাট। টাল সামলাইয়া চলতে না পারলে মুশকিল।

আচ্ছা ধর, মজিদ যুক্তি দেখিয়ে বলল, এ রহম করা গেল। এরপর কী করবা?

এর জন্য এতো ভাবনা কি? দু'একজনের পাড়াইয়া দিমু টাউনে কাগজটায় তো ঠিকানা লেহা নাই। তবু কোন অসুবিধা অইব বইলা মনে অয় না, বুদ্ধি থাকলে ওরারে খুঁইজা বার করুন যাইব। এরায়ে বললে এর নিশ্চয় আইব। আমরার সঙ্গে যোগ না দিয়াই পারে না। কি কও?

একথা ঠিক। কিন্তু তারারে পাওয়া মুশকিল।

আরে মুশকিল কিছুই না।

কেমন একটা যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি রহিম বখ্শের মগজে ঠেলে ওঠে, কেমন একটু ভয়, একটু কাঁপুনি।

তোমরা কী কথাবার্তা কইতাছ? মোচে আবার পাক দেয় লেঠেল সর্দার।

কিছ্ছুনা। কিছ্ছুনা সর্দার সাব!

অনেক রাত অইছে, ঘুমাইবা না তোমরা?

আমরা না ঘুমাইলে তোমার কি? তোমার কাজ তুমি করো।

মিষ্টি গলায় তোয়াজ করে সর্দার, আহা ভাই, অতো চটো কেন। তোমরার ব্যথা কি আমি বুঝি না?

বুঝো নাকি? মজিদ ব্যঙ্গ করে বলল, তা অইলে তোমারে দোস্তই কওয়া যাক্।

মসজিদে এশার নামাজ শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। লেঠেলরা বারান্দায় জটলা করছে।

আবার ঠাণ্ডা হাওয়া, কনকনে।

মিনারের ইটের স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে দুজন লোক কথা বলছে চাপা গলায়।

মোটাসোটা লোকটার হাতে হারিকেন, সলতে কমানো। নোটের তাড়াটি হাতে দিয়ে ছোট সাব বললেন, 'আরো চাইলে আরো। অবস্থাডা দারোগার কাছে বুঝাইয়া কইও। রাতের জন্যই ভয় বেশি। আরে হ্যাঁ, কইও রাইফেলওলা পুলিশ আনে যেন।

গোমস্তা বলল, আজকাল সব পুলিশই বন্দুকওলা। দিনকাল খারাপ তো।

রাতে রাতেই যেন আসে। ভোরের আগেই একটা কিছু হইতে পারে।

সর্দাররা আছে। চিন্তা করবেন না।

যাও তাড়াতাড়ি।

আপনি একটু সাবধান থাকবেন। বাতিটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে গোমস্তা নেমে গেল রাস্তায়। থানার পথ আড়াই মাইলের নয়। ছোটসাব হাতের আঙুলে কপালের চুলগুলো উলটিয়ে নিলেন। রাত বাড়ে। হাঁক ছাড়ে সজাগ লেঠেলরা। গলা খাকরানি দেয়।

তারপর অন্ধকারে গুটি মেরে ভূতের মতো মানুষগুলো এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় বাড়ির চারদিক দিয়ে। চুপে চুপে সন্তর্পণে। বাঁশের খণ্ড পাজন আর লাঠিধরা হাতগুলো কাঁপে, নড়ে ওঠে। বুকগুলো দুরুদুরু। চোখ থেকে ঠিকরে পড়রছ আগুন। ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। ঝাঁপিয়ে পড়বে।

লেঠেলরা জেগে ওঠে। সাবধান হয়।

সাবধান! নইড়োনা।

মরবা।

অন্ধকারের বুক চিরে কতগুলো তির্যক আওয়াজ।

কতকগুলো আর্তনাদ, চিৎকার।

দৌঁড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি।

ডাকাডাকি, ভয়ার্ত ক্রন্দন।

তারপর আগুন জ্বলে ওঠে। লাল হয়ে যায় রাতের আসমান।

কারো চোখে ঘুম নেই। আশ্চর্য রাত। বাম হাতের কব্জিটা থেৎলে গেছে। উরুতেও ঘা খেয়েছে কম নয়। ব্যথায় দাঁত কিড়মিড় করে উঠে। দাঁড়ায় রহিম বখ্‌শ, আরো শক্ত করে ধরে লাঠির মুঠ। কুয়াশার জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে সূর্য উঠছে প্রতিদিনকার মতো, চলে যাওয়া রাতের ছাপ হয়তো তার গায়ে স্পর্শও করেনি। বাড়ির ভিতর আর চারপাশ ঘিরে লাঠি-সড়কি হাতে দাঁড়িয়েছে ওরা, প্রায় দুইশত মুক্তিসংকল্প মানুষ।

শুকুর পড়ে আছে বারান্দায়। ফাটিয়ে দিয়েছে ওর মাথাটা। রক্ত বারান্দায় চুপসে গেছে।

ছোট সায়েবটা কই?

পালাইয়া গেছে।

ছোকরা লেঠেলরা টিকতে পারেনি। সর্দার কিন্তু যায়নি কোথাও। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

কাঁধে হাত রেখে রহিম বখ্‌শ জিগগেস করল, কেমন লাগতাছে?

কেমন লাগব। সর্দার মোচে পাক দেয়, বলল, বাতাস যেই দিকে বয়, পালের নাও হেই দিকে যায়।

ত অইলে তোমারে বিশ্বাস করা যায় না!

কেন? খ্যাক্‌খ্যাক্ করে হেসে উঠল সর্দার, জানো এদ্‌দিনে ওস্তাদের বিদ্যা কাজে লাগাইবার জায়গা পাইলাম। এদ্‌দিন জুলুম কইরাছি নিজের উপর। নিজের উপরই

লেলাইয়াছি নিজের তাকত। অহন ত লাগাইব নিজেরে বাঁচাইবার লাইগা। এর চাইতে আনন্দ কই আছে?

আবার হেসে উঠল সর্দার।

শুকুরের মাথায় জলপট্টি দেয় রহিম বখ্‌শ। বৈঠকখানার চৌকির ওপর কাঁথা বিছিয়ে শুইয়ে রাখে। ও উঠে পড়তে চায়। ধরে শুইয়ে দেয় আবার। রহিম বখ্‌শ চারপাশে ঘোরে আবার। দেখাশোনা করে।

সূর্যের আলো কুয়াশা ভেদ করে ঝলকে ঝলকে ঠিকরে পড়েছে বাড়িটার ওপর। লাঠিটায় ভর করে রহিম বখশ বাইরে এল। কতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াল।

কতক্ষণ পর মধু দৌড়ে এল। বলতে লাগল, দেইখা যাও জলদি, দেইখা যাও।

কী দেখুম? হাত ধরে টেনে নিতে থাকলে প্রশ্ন করল।

সবাইরে ডাক দাও, সর্বনাশ! থর্‌থর্ করে কাঁপছে মধু, সবকথা যেন বলতে পারছে না।

কী সর্বনাশ।

পুলিশ আইতাছে। সেলজার সেপাই!

পুলিশ? সেপাই?

কিছুক্ষণের ভেতর সবাই দল বেঁধে বাইরে এসে দাঁড়াল। শুকুরও উঠে এসেছে। মাঠের মাঝখানে বড় পথ দিয়ে দুইদল আসছে মার্চ করে, সামনের দলের প্রত্যেকের মাথায় লোহার টুপি আর পিছনের দলে লাল পাগড়ী। দুই দলেই রয়েছে রাইফেল। তাদের অনেক পিছনে বড়ো বড়ো লাঠিহাতে একদল যুবক আসছে প্রায় দৌড়িয়ে ; রাইফেল, লাঠি আসছে এগিয়ে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। দাঁড়াতে হবে এইবার।

ভাল করে মালকোচা দিল রহিম বখ্‌শ। ওরা দু'দলে ভাগ হল। যাদের বয়স কম তাদের লাগানো হয়েছে লড়াই এর জোগান দেয়ার কাজে, ছুটাছুটি করে ওরা জড়ো করছে ইট পাটকেল লাঠি সড়কি দা কুড়োল। শক্ত সমর্থ জোয়ানদের গঠিত দলটি প্রতিরোধ রচবে প্রথম, দ্বিতীয় দলটি আক্রমণ করবে পিছন থেকে দৌড়ে এসে। আর দেরি নয়। তৈয়ার তৈয়ার, হুঁশিয়ার।

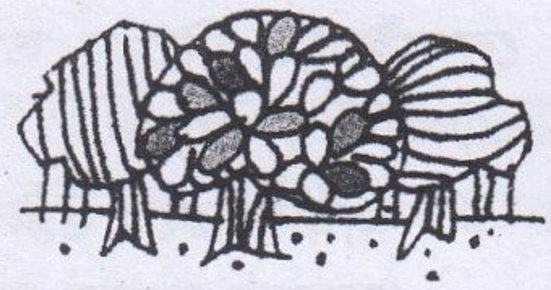
ওরা আসছে মার্চ করে। বেয়নেটগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে সূর্যের আলোয়। বল্লমহাতে সুমুখভাগে দৌড়ে গেল রহিম বখশ।

এক সঙ্গে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, তুমি কই যাও? আমরা যাই, তুমি পিছে থাহ।

উঁচু গলায় চিৎকার করে জওয়াব দিল, না, না। আমি বুড়া মানুষ, মরলেও কোন ক্ষতি নাই। আমিই সামনে দাঁড়াই!

নভেম্বর, ১৯৪৯।

শিষ ফোটার গান



এখন অচেনা গন্ধ নেই চুলে যদিও এককালে জৌলুস কম ছিল না। উস্‌কোখুস্‌কো তবু ঘনকালো নিবিড় তা তার প্রমাণ। দু'জনেই মাথা রেখেছে নোংরা চিটচিটে বালিশটাতে কোনমতে; মুখের দূরত্ব সামান্য। শোওয়ার সময়ই খোঁপা খুলে দিয়েছিল, এপাশওপাশ করায় সিথানে ও আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে কেশগুচ্ছ। সেগুলো জড়িয়ে গলার কাছে মুখ লুকায়, অনুভব করে ওর পরিমিত শ্বাসপ্রশ্বাস।

আবদুল মজিদ ঘুমোতে চায়, কিন্তু কী যেন তার মাথার ভিতরে কপালের দু'পাশের রগ তাতিয়ে তুলে ঘুরে বেড়ায়। অনেকক্ষণ বুজিয়ে রাখতে রাখতে চোখ জ্বালা করে। ঝট করে সে তার লোমশ হাতটা ছেড়ে দেয় মমিনার বুকের উপরে, অস্বস্তিতে।

তার অজান্তেই অস্থির ; কিন্তু ময়লা শাড়ির ছেঁড়াপাড়ে আঙুল জড়িয়ে যেতে তা থেমে যায়, আর তাতে কাঁচা লোহার মতো শীতলতা।

চোখ নাই তোমার? দেখতে পাওনা? গত হাটবারেও কেরোসিনের বোতল খুলে দিতে গিয়ে গজ্‌গজ্‌ করেছে। একটা বলতে একটা কাপড় শাদির সময় যে ব্যবহারীটা দেয়া হয়েছিল তাই একটানা পরে এসেছে। আরেকটি ছিল, ভেজাবার। তেনা হয়ে গেছে। পরনের কাপড়টা এতদিনে এমন নরম হয়েছে, একটু আঁট করে বসা যায় না। ছিঁড়ে যায় চড়চড়, একটু অসাবধানে থাকলে গতরের কোন না কোন অংশ বেগানা পুরুষের নজরে পড়বার জোগাড়। বাইরে না গিয়েও উপায় নেই, এই হালে ইজ্জত বাঁচে কি করে?

বৌরে কাপড় দিতে পারে না এমন মরদের আবার বিয়া করবার শখ! শরম করে না? ওর মনের দুঃখ কথায় ফলায় ছিটকে বেরিয়েছে, ক্যারে তুমি আমারে ঘরে আন্‌লা? একলা আছিলাম ভালা আছিলাম। তুমি কি চাও গলায় দড়ি বাইন্ধা মরি?

কোন জওয়াব দিতে পারেনি মজিদ, একটা অবোধ্য বেদনার বাষ্প বুক ঠেলে উঠে তার কণ্ঠরোধ করে দেয়। দাঁড়িয়ে থাকে অপরাধীর মতো। ছ'মাস ধরে একসঙ্গে ঘর করছে বলে নয়, আশৈশব কাছাকাছি কাটিয়েছে বলেই ওর চরিত্র তার নখে আঁকা। সে জানে কম দুঃখে অভিযোগ করে না। কত সাধ ছিল, মনের মানুষকে ঘরে আনলে, সংসার ভরে উঠবে সোনায় সোনায়। ভরপুর আনন্দ আহ্‌লাদ। এখনো মনটা অবশ্য মরে যায়নি হাড়ভাঙা মেহনতেও ; তবু প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে ও। ডগমগে স্বাস্থ্যবতী ছিল, এখন ক্রমশ হলদেটে রং। ঠোঁটজোড়া ফ্যাকাশে। লাবণ্য লালিমা ছেয়ে নেমে এসেছে ক্লান্তির ছায়া।

তবু চেষ্টার তো খেলাপ করে না। সারাদিন ভূতের মত খাটে বাজারে বন্দরে, মুট্‌ বয়। তামাটে শরীর বেয়ে ঘাম ঝরে। সে হাঁপায়। কড়া রোদ, সেদিকে একটুও খেয়াল করে না। একটা আশ্চর্য মধুর ভাবনায় তার সারা অস্তিত্ব ডুবে থাকে, পরিশ্রম ও ক্লান্তিতে ভরে দেয় একটা অস্পষ্ট কলগুঞ্জন।

কিন্তু এসব অনুভূতিও পুরনো হয়ে গেছে। নিচু মাথা ধীরে ধীরে তোলে, ধরা গলায় বলেছিল, আর কয়টা দিন সবুর কর, খেতের ধান পাকলো বইলা। তখন আমরার দুক্‌খু

থাকব না।

খেতের ধান! মমিনা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, ভারি তো দুইকানি খেত। তার মইধ্যে অর্ধেক যাইব গা বর্গাদারের গোলায়! দুখ্খু থাকব না!

নিমেষে রুক্ষতা জমাট চেহারায়, রোদজ্বলা মুখের চামড়া কুঁকড়ে যায়, কুটিল ইচ্ছা চোখের তারায়। ও মিথ্যে বলেনি, আবার তা সত্যও নয়। তার হাতে কাস্তের গন্ধ, পায়ের নিচে সোঁদালো মাটির অনন্ত আদর, প্রত্যেকটা ধানগাছ তার লোমশবুকের শ্রাবণনদীস্নেহে বেড়ে উঠেছে, সেখানে কোথায় বর্গাদার?

টেহা দিছি, আবার ধানও? একটা কথা মুখ থেকে বাতাসে ছুঁড়ে মারল মজিদ, দিমুনা।

এরপর বোতলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেছে হাটের উদ্দেশ্যে।

বাড়ি ফেরার পথে মাঠের মাঝখানকার টিলাটার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। সন্ধ্যা নেমে আসে। দিগন্তের কোলঘেঁষা গাছপালার ওপর থেকে রঙিন আলোর লেখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, চারদিক আবছা অন্ধকারে রহস্যময়। গামছার এক প্রান্তে বাঁধা চালের পোটলাটা পায়ের কাছে মাটিতে রেখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। এদিক ওদিক করে। ধানগাছ ডাগর হয়ে উঠেছে, সব খেতে সবুজ প্লাবন, ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে চলে চিরল পাতায়। অগুনতি উজ্জ্বল তারাভরা আসমানের দিকে তাকিয়ে বেজায় খুশি। লুঙির গাঁট খুলে ধরায় একটা বিড়ি, এরপর টিলার ওপর থেকে নেমে খেতের পাশ দিয়ে চলতে থাকে আনমনা। একটু নুয়ে অনেকগুলো ধানগাছ একসঙ্গে বুকের কাছে আগলে ধরে একবার, টেনে নেয় নাকে কাঁচা গন্ধ। উহ, কতদিন আর কতদিন? খামার ছাড়িয়ে অনেক দূর এসেও ফিরে ফিরে তাকায় সেইদিকে। গুন্‌গুন্ একটা গানের কলি ঠোঁটের কাছে জাগল, সখি তোমার পীরিতি সবুজ ধানের পাতা, নিশিরাইতে ঘুমাইনা গো, কবে অইব সোনালতা।

বাড়ি এসে গম্ভীর মুখে তামাক জ্বালিয়ে টানে বারান্দায়, পিঁড়িতে বসে।

এক সময় মমিনা কাছটিতে গিয়ে নরম গলায় বলে, আমার কতায় তুমি রাগ করছ?

না, না। জলদি মজিদ ওর হলুদমাখা হাতটা টেনে ধরে, আদর করে বলে, না মণি না। তুমি আমারে বিশ্বাস কর, আমি তোমার লাইগ্যা—

কথা আটকে যায়, আধো-আলগা খোঁপাটায় আঙুল বুলিয়ে চুলগুলি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দেয় পিঠের উপর। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে অপলক। চোখ ফিরিয়ে নেয় মমিনা, ঝর্‌ঝর্ করে দু'ফোটা পানি গড়িয়ে পড়ে ওর গাল বেয়ে।

সন্ধ্যা হতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলে ওরা, কেরোসিন যা আক্রা। অধিক রাত পর্যন্ত কুপি জ্বলিয়ে রাখা যায় না। পাতলা কাঁথাটা পেট অবধি টেনে মমিনা শুয়ে চুপচাপ চাউনি মেলে থাকে অন্ধকারে। গামছাটা উদাম গতরে জড়িয়ে মজিদ বসে থাকে শিয়রের কাছে। বাঁশের বেড়া যেখানে ভেঙে গিয়েছিল, কেটে ছেঁটে সেখানে একটা ছোট জানালা করেছে। জাল নেই খাপের চতুষ্কোণ খোপ। ওখান থেকে মুখ উঁচিয়ে সে চেয়ে থাকে জ্বলজ্বলে তারার দিকে, যতদূর দেখা যায় বাঁশঝাড়ে মৃদু সর্‌সর্ আওয়াজ। ঈষৎ শীতল ঝিরঝিরে হাওয়া তার কানের চিকন রোম ছুঁয়ে যায়, আর সে বসেই থাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। রাত এগিয়ে চলে, তারও প্রতীক্ষার শেষ নেই, এক অদ্ভুত ধারণা তাকে পেয়ে বসেছে, মনের সরু তারগুলো একেকবার ঝংকার দিয়ে ওঠে, খামারের দিকে থেকে রিণ্‌রিণ্ ঝিণ্‌ঝিণ্ যেন সে শুনতে পায় কিসের গুঞ্জন ধ্বনিপ্রতিধ্বনি।

মণি! ও মণি! কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকে।

কী! ঘুম ঘুম স্বরে মমিনা বলল, কী অইলো তোমার? অহন একটু ঘুমাও না, সুরুজ উঠবার আগেই তো কামে যাইতে অইব, একটু ঘুমাও।

বিছানায় ওকে জড়িয়ে বলল, আমার ঘুম অইব না। তুমি ওডো। কুপিডা একটু জ্বালাও। একটু জলদি জ্বালাও!

হঠাৎ ঘুমভাঙার আধো অচেতন জড়িমা। প্রথমত মমিনা কিছুই ঠাহর করতে পারে না, তারপর যখন স্বামীর অর্থভরা ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কানে বাজে তখন সে একেবারে সোজা হয়ে বসে। পাতিলের আগুনে শুকনো পাটশলা গুঁজে দিল জলদি, তা থেকে ধোঁয়া উঠতেই তুলে নিয়ে ফুঁ দিল। আগুন জ্বলে ওঠে, কুপিটা জলচৌকির ওপর রাখতে রাখতে নিজের কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিল, চেহারায় বিহ্বলতা, জিগগেস করল, কি অইলো? কি!

জানালায় মুখ বাড়িযে মজিদ বলল, কিছুই বুঝতাম পারতাছিনা, এদিকে একটু আও তো।

অত রাইতে যতসব পাগলামি!

কাছে গেলে ওকে আগলে ধরে মজিদ বলল, হুন, ওই দিকে কান পাইতা আহ, একটা গানের মতন কিছু হুনা যাইতেছেনা?

একটু নুয়ে কান বাড়িয়ে অনেকক্ষণ ঝিম্ ধরে থাকে দু'জন। মমিনার খোলা চুল নাড়িয়ে যায় হাওয়া। ওর বুকের ভিতরটা ধুক্‌ধুক্ কাঁপতে থাকে। বাঁশপাতা নড়ার একটানা মৃদু শব্দ হচ্ছে বাইরে। এঁদোবনের পোকাগুলি ঝিন্‌ঝিন করে ডাকে, একবার শোনা গেল খাটাশের গলার আওয়াজ, ও-পাড়ার কথাবার্তাও একেবারে অস্পষ্ট নয়। কিন্তু এর বেশী কিছু শুনতে পেল না। অনেকক্ষণ থেকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার মুখের দিকে। সে বিড়বিড় উচ্চারণ করে, কই? কি?

ওই যে! কেমন একটা আওয়াজ! একতারার বাজনার মতন কি হুনা যায় হুনো, আমি যাই।

মমিনার ভয় লাগে, বলল, কই যাইবা অত রাইতে!

খামারে, আমি খামারে যাইয়াম!

গামছাটা মাথায় আঁট করে বাঁধল। তার হাতে পায়ে হঠাৎ কেমন একটা চাঞ্চল্য এসেছে, নিজেই যেন কিছু বুঝতে পারছে না। বেড়ায় ঠেসান-দেওয়া পাজনটা হাতে তুলে নিল। আর কোন কথা না বলে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার সময় জলদি বলল, তুমি ডরাইয়না মণি। আমি আইতাছি।

মাঠ বেশি দূরে নয়। কয়েকটা বাড়ি ছাড়ালেই কাঁঠাল-বাগিচা। ডোবার ধারে একটা ঝাউ গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পেঁচা ডাক ছেড়ে উড়ে গেল। বাড়ির তালগাছে বাদুড় কোলাকুলি করছে। ঝলমলো তারাভরা আকাশের ম্লান আলোর আভায় শুকনো বড়ো রাস্তাটা সিঁথির মতো প্রসারিত হয়ে গেছে। এরপরই শুরু হয়েছে ধানখেত।

পাজনটা মুঠোয় চেপে মজিদ এগিয়ে গেল। রাত একটার কম হবে না। কোনদিকে লোকজন কেউ নেই। আবছায়া অন্ধকারের তলে ধানগাছ দুল্‌ছে শিশির-ভেজা হাওয়ার ছোঁয়ায়।

একটা খেতের ধারে এসে ঝুঁকে পড়ল সে পাজনে ভর দিয়ে। কতকগুলি ধানগাছ টেনে নিল মুখের কাছে। দৃষ্টির আরো কাছে। কপাল কচলে দু'চোখ বিস্ফারিত করল। হাঁ, শাদা শাদা কি যেন দেখা যাচ্ছে। আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কি যেন অনুভব করতে চায়। নিমেষে তার

শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। হাসবে কি কাঁদবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। সে যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। খেতে শিষ ফুটতে শুরু করেছে!

ছোটবড়ো আল ধরে সে উধাও হয়ে ঘুরে বেড়াল। কতবার পড়ো ঢেলায় হোঁচট খেল, পড়তে পড়তে টাল সামলিয়ে নিল পাজনে ভর দিয়ে। সে খেয়াল করেনি, ভিজে হাওয়ায় সারা শরীর হিম। কান দুটোতে যেন বরফের ছোঁয়া। বুকের স্পন্দন দ্রুততাল। গোড়ালি কখন ব্যথায় টন্‌টন্ শুরু করেছে, তা সে বলতেই পারবে না। অবশেষে যখন ভীষণভাবে হাঁপিয়ে উঠল, টেনে টেনেও চলবার শক্তি রইল না, সে ঘরমুখো হল। নিজের কাছেই নিজেকে দুর্বোধ্য ঠেকছে, আর অসহনীয়। তাকে যেন নিশিতে পেয়েছে।

কানে হিসহিসে হাওয়া।

একটা কথা বিষ-মাখা তীরের মতো কানে বিঁধল, ভারি তো দুইকানি খেত। তার মইধ্যে অর্ধেক যাইব গা বর্গাদারের গোলায়। দুক্‌খ্ থাকব না!

না, না! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে চায় মজিদ, কিন্তু তার ঠোঁটের দু'কশ দিয়ে ফেনা ছুটল। কোন কথাই বেরুল না।

কে খবর রাখে, দু'কানি জমি পত্তন নিতে তার কত বেগ পেতে হয়েছে। কত স্বার্থত্যাগ। ছ'মাস খেয়ে না খেয়ে, কঠিন মেহনতে, তিলে তিলে সে যা সঞ্চয় করেছিল, তা-ই তুলে দিয়েছে, তবু কেবল টাকা হলে কথা ছিল না। মায়ের শেষদান বউয়ের জন্যে যে সামান্য জেওর, তাও সে ধরে রাখতে পারেনি। একটা মাদুলি ছড়া দুটো কানপাশা ছিল সোনার। আরেক জোড়া রুপোর গোলখাড়ু। মউতের তিনদিন আগে চোখের পানি ঝরিয়ে মা বলেছিল, তোর বাপের দেওয়া জেওর! আকালের সময়ও বেচি নাই। বউয়েরে দিস্। অনেক সাধ আছিল, দেউখা যাইতাম পারলাম না!

মনে পড়ে, সেদিন রোববার। কাস্তেটা বগলদাবা করে সে গেরস্ত-বাড়িতে ঘুরে বেড়াল। কামলা খাটাতে চাইল না কেউ। ধুধু করছে মাঠ। বৃষ্টি নেই। আসমানে নেই এতটুকু মেঘের বাষ্প। আগামী মৌসুমের জন্যে জমি কেবল তৈরি হচ্ছিল, খেতগুলি এঁটেল পাথরের মতো জমাট-বাঁধা, লাঙল খর্‌খর্ করে ওঠে। দুপুরে হাঁটলে পা পুড়ে যায়। তবু হাল না চষে, ফসল না বুনে উপায় নেই। মজিদ ঘুরে বেড়াল, উলুকান্দির খামারেও যেতে ভোলেনি, কিন্তু পয়সা দিয়ে লোক খাটানোর মতো একজন গেরস্তও সে দেখতে পেল না। মনটা বিষিয়ে উঠেছিল, মিঞাবাড়ির বৈঠকখানায় এসে যে কথাটা শুনতে পেল, তাতে একমুহূর্ত সেখানে দেরি করল না, প্রায় দৌড়ে বাড়ি এল। মমিনা খুদের ঝাউ রাঁধছিল। কাছে গিয়ে আমতা-আমতা করে সে বলল, একটা কতা কইতে চাই, কিচ্ছু মনে কইরো না।

মনে আবার করবো কি। মমিনা শান্তস্বরে বলল, কি কতা কও না!

মজিদ বলল, তুমি রাগ কইরো না মণি। এভাবে আমরার আর কয়দিন চলব। যে ভীষণ খরা কামকাজ পাওয়া মুশকিল। সামনের বছরও যদি কেবল গতর খাইটা পেট চালাইতে চাই তা অইলে আর কয়দিন বাঁচুম। হুইন্যা আইল্যাম, মিঞাবাড়ির সব জমিন পত্তন দিতাছে। কিছু জমিন রাখতে পারলে অন্তত চার পাঁচ মাসের খোরাকিও যদি অয় জানডা অনেক হালকা অইব।

পাকালের ভিতরে একমুঠো খড় গুঁজে দিল মমিনা, গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুনটা ধরিয়ে বলল, রাখতে পারলে তো কতাই নাই।

কিন্তুক টেহা? কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদ বলল, টেহা না অইলে সব আশা বিফলে যাইব।

খেত তো নিতাছ আধি বর্গা। টেহা লাগব কেন? এবার তাকিয়ে দেখে মমিনা স্বামীর ঘামে ভেজা তামাটে মুখটা, সত্যই কষ্ট করছে।

সেলামি! মজিদ বলল, বাঁশের থাইক্যা কঞ্চি বহুৎ বড়!

বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কথা বলতে বলতে দু'জনে একটা ফয়সালা করে। মজিদের চোখে বারবার ভেসে উঠছে মায়ের মুখ, তার কণ্ঠের কাতরতা। অন্তিম-বাসনার আন্দোলন। বুকের ভিতরটা হু-হু করে উঠছে—যা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না, তাই করতে চলেছে। সে ওর ডানহাতটা টেনে নেয় তার খসখসে মুঠোর ভিতরে, চুলভরা মাথাটা গলার কাছে প্রথম কথা বলতে পারেনি, পরে ভেজা-গলায় মমিনা বলেছিল, নিজে পরুম বইলা নয়, মুরুব্বির হাতের জিনিস তার লাইগ্যা না করছিলাম।

তুমি জাননা মণি, জেওরগুলান বেচতে আমার কত কষ্ট। কিন্তুক কি করুম। কপাল মন্দ। তুমি আমারে ভুল বুইঝো না! তুমি আমারে বিশ্বাস কর, ফসল অইলে আবার বানাইয়া দিয়াম।

রাতের অন্ধকারে, মাঠে থেকে একা ফিরতে এসব তার মনে পড়ছিল। তার মতো, অন্য যারা বর্গা নিয়েছে, তাদেরও এই একই অবস্থা। কেউ চালের টিন বিক্রি করেছে ; কেউ আমগাছ; কাঁঠাল গাছ। কেউবা ধার নিয়েছে মোটা সুদে। সেলামি ছাড়া জমি পাওয়ার উপায় ছিল না। তার ওপর মৌসুমের শেষে অর্ধেক ধান তুলে দিতে হবে মিঞাবাড়ির গোলায়। টু শব্দটি করা যাবে না, এক ছড়া কম দিলে চলবে না।

অথচ এককালে এই খামারের জমি তাদেরই ছিল। দিনে দিনে মিঞা কিনে নিয়েছে সকলের কাছ থকেই কন্ট্রাক্টরি ও কালোবাজারীর টাকায়। অভাবের ঝড়-ঝাপটায় পোড়-খাওয়া মানুষগুলিকে একটি মাত্র লোক কুমিরের মতো গ্রাস করেছে। ভাবতেই দৃঢ় হয়ে ওঠে মুখ, কঠিন চিবুক। সে বাঘের মত জ্বলতে লাগল।

কাঁঠাল বাগিচার কাছে একটা ছনের ঘরের সামনে এসে থামে, দুয়ারে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, মনছুর ভাই আছ ও? ধুপধাপ্ আওয়াজ করে আট নয়বার, তারপর গরগরে গলা শোনা গেল।

এত রাইতে ক্যাডারে? চোখ কচলিয়ে বাইরে এল, দেখে বলল, ও মজিদ, এত রাইতে কি খবর?

একটু এগিয়ে মজিদ বলল, রাইত কই! আসমান ফরসা অইছে, জরুরি কতা আছে।

আসলে সকাল হওয়ার অনেক দেরি। কেবল মাঝরাত উত্‌রেছে। ঘুমটা কেবল জমে এসেছিল, মনছুরালি বারান্দায় পিঁড়িতে বসে ওকে বলল কাছে আসতে।

গোটা ব্যাপারটা খুলে বললে হঠাৎ ঘুম কেটে যায়, গতরটাও কঠিন হয়ে উঠল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, তুই ব মজিদ, আমি তামাক-টিক্কা নিয়া আই!

ঈষৎ কুয়াশার আড়ালে তারাগুলি মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল। কিন্তু দু'জোড়া চোখের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। দু'জনে বসে বসে তামাক টানল, আর কথা বলল চাপাস্বরে ; কথার প্রতিধ্বনি তাদেরই কানে এসে বাজল কড়া শাসনের মতো। ভবিষ্যতে একচুল নড়চড় হলে চলবে না। মনছুর কথা বলে কম, কিন্তু যা বলে একেবারে মোক্ষম।

শেষ তক্ ঠিক থাকবে তো?; হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে ও জিগগেস করল।

ভরা গলায় মজিদ বলল, তুমি আমারে বিশ্বাস করতাছ না? গতর ছুঁইয়া কড়ার করলাম, কতার যদি নড়চড় অয়, আমি যেন মইরা যাই। পঞ্চায়েতের লাইগা আমি জান দিয়াম।

তা অইলে বুধবারে সবাইরে ডাকি। চিন্তিতভাবে বলে মনছুরালি, কি কও?

আইচ্ছা। মজিদ বলল, গুরুত্বডা বুঝাইয়া কইতে অইব।

যখন বিদায় নিল বাঁশঝাড়ে কয়েকটা পাখি পাখা ঝাড়তে শুরু করেছে। কিচিরমিচির ডাক। রাস্তায় বেরিয়ে ভাবে আকাশপাতাল। একটা নতুন পথে তারা পা বাড়াচ্ছে। যেখানে মানের ভয় আছে, জানের ভয় তো আছেই। তবু সে জানে এ সত্য পথ। তার মনে উজ্জ্বল বিশ্বাসের দীপশিখা হঠাৎ যেন দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠেছে। সবকিছু মুখ বুজে সয় বলেই ওরা আস্কারা পায়, তা নইলে এত টাকা নিয়েও অর্ধেক ধান দাবি করার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে। বছরে একবার মাটিতে পা ফেলে না, জুতো পায়ে মচ্‌মচ্ করে ঘুরে বেড়ায় অথচ রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, হাড়মাস চূণ করে ফলানো যে ফসল, তাও ঘরে তুলতে পারবে না?

কানের পাশের কাঁটামতো চুল আঙুল দিয়ে ঘষে। উঠোনের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল, বলে উঠল, কে? মণি! তুমি ঘুমাও নাই?

না। মমিনার স্বরে অভিমান, জিগগেস করল, কই গেছলা?—কি দেখলা?

মজিদ কাছে গিয়ে রহস্যভরা স্বরে বলর, সুরুজ উঠতাছে মণি, সুরুজ!

কই, অহনো অনেক রাইত। একটু অবাকই হয় মমিনা বলল, তুমি কি কইতাছ?

ওর হাত ধরে ঘরের দিকে যেতে যেতে মজিদ অদ্ভুত গলায় বলল, তুমি কিচ্ছু বুঝ না মণি। চাষীর জীবনে সুরুজ তো একবারই ওডে, সে ফসল জাগার সময়!

সত্য সত্যই সূর্য উঠল।

সেতারে এলোপাথাড়ি আঙুল চালিয়ে গেলে যেমন আশ্চর্য সুরঝংকার, তেমনিভাবে বেজে উঠল সমস্ত গ্রামের মানুষের মনপ্রাণ। ঘরের বেড়া ভেঙে পড়েছিল, দিনরাত চড়ুইয়ের মতো লেগে থেকে মেরামত করে তুলল। বাঁশ কেটে লাগাল নতুন খুঁটি। উঠোন আগাছায় ভরে উঠেছিল, কোদাল দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করল। বউ-ঝিদের সযত্ন হাতের লেপনে তকতকে হয়ে উঠল ঘর আর উঠোন। মরচে ধরা কাস্তেতে নতুন শান।

টিঙটিঙে পা, পেটমোটা ছেলেমেয়েগুলো বাইরে বেরুল সূর্যের আলোতে, তাদের হাতে লাটিম, ডাংগুলি। মুখে হৈ হুল্লোড়, চিৎকার। দুপুর বেলায় একসঙ্গে গাঙে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ডুব-সাঁতার উপরি-সাঁতারে পানি তোলপাড়। বিকেলবেলা তারা টুনটুনির বাসা খুঁজে বেড়ায় ডোমরা-ঝোপের পাতার আড়ালে। বৌয়েরা পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট লাল করে। সুই-সুতো নিয়ে কাঁথা সেলাইয়ে বসে যায়। থলথলে মুখ বুড়িরা, তাদের জটাচুলেও কাঁকই পড়ছে।

বুড়োরা আমতলায় খুলে বসে জংনামার পুঁথি, বয়াতী গতর কাঁপিয়ে ছন্দে ছন্দে আবৃত্তি করে ঃ

যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
সের জুদা কৈল যদি এমামের তরে।।
আরশ কোরশ লওহ কলম হইতে।
বেহেস্ত দোজখ আদি লাগিল কাঁদিতে।।

অত্যন্ত করুণ ঘটনা, তবু পাঠের গমকে আর কথায় মুখরিত মজলিশ।

কিন্তু খামারের চারধারে যে মুখরতা তার নজির মেলা ভার। গ্রাম বাদ দিয়ে জায়গাটার বেড় চার মাইলের কম হবে না। ধান ছাড়া অন্য কোন ফসল নেই। দাঁতে কামড় দিয়ে সেলামি যারা দিতে পেরেছে, তারাই জমি পেয়েছে। তবু তিন কানির বেশি কেউ কুলিয়ে উঠতে পারেনি। তাই অন্য কোন ফসলের কথা, অবান্তর। পাট অবশ্য বোনা যেত, কিন্তু তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। বাজার যেমন মন্দা, তাতে দু'কানি জমির পাটে একটা পরিবারের দু'মাস চলে কিনা সন্দেহ। অপর পক্ষে, ধান বুনলে, ফেলে থুয়ে খেলেও অনায়াসে চারমাস চালিয়ে নেয়া যায়। বিশেষ করে এবার আকাশের অবস্থা অনুকূল, বৃষ্টি হয়েছে মন্দ না। সূর্যের আলোতেও যেন নয়া যৌবনের রং। প্রকৃতির অকৃপণ স্নেহধারা, তার জল-হাওয়া, তার সুবর্ণ আলো, পনেরো দিনেই ধানশিষ পরিপুষ্ট করে তুলেছে। সবুজ পালাতে শুরু করেছে, পাতায় পাতায় হলুদের ছোপ। ধানগাছ হাওয়ায় দোলে, এলিয়ে পড়ে। চোখ ফেরানো যায় না।

তাদের দৃষ্টিও সারাক্ষণ ওদিকেই জাগ্রত।

মাঠের চার কোণায় চারটি টঙ্ তৈরি। চার পাশে শক্ত বাঁশের খুঁটি, একটু ওপরে সুপারি-ফালির মাচান। তারও উপরে তালপাতা ও চাটাইর ছাউনি। অতি-উৎসাহী ছোকরারা হরদম বসে মাচানের ওপর পা দোলায়, শিষ দেয়। আর বারে বারে বাজায় বাঁশের ঠক্ঠকি যদিও চড়ুইর ঝাঁক এখনো পড়তে শুরু করেনি।

বন্দর থেকে সারাদিন গতর খেটে এসেও জোয়ানেরা বসে থাকে না। চটপট খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ে, প্রত্যেকের হাতেই একটা করে শক্ত লম্বা লাঠি।

রাত্রে পাটশালার মশাল জ্বালায়, এদিক ওদিক কেবলই ঝলমলে আলো।

লাল আগুনের আভায় একেকটি জোটের মুখ সকাল অবধি জাগে। কী যে আলোচনা করে, কোন্ ধরনের গল্প করে, এরা ছাড়া আর কেউ জানে না।

সে রাত্রে দু'তিনটে পেয়াদার সঙ্গে মিঞাবাড়ির সরকার এসেছিলেন। লোকটা ঠিক বাজপাখির মতো। কপাল চওড়া, চোয়াল-বের-হওয়া কঠিন চিবুক। আর নাকটা বেমানান খাড়া হয়ে উঠেছে। অনেকে বলে, তার কুটবুদ্ধিতেই নাকি ও-বাড়ির উন্নতি। তার টাকপড়া চকচকে মাথার ভিতরে মধুপুরের তল্লাট। পায়জামা পরা পাঞ্জাবী গায়ে মাথা-বাঁকা বেতের লাঠিটায় ভর দিয়ে এসে দাঁড়ালেন দুনম্বর টঙের ধারে-পেয়াদারা তার পিছনে। মনছুরালি একটা জলচৌকি বাড়িয়ে দিল।

না রে অহন বইতাম না! সরকার বললেন, অনেক কাজ আছে।

বসেন না একটু, তামুক খান্। আন্তরিকভাবে অনুরোধ করে মনছুরালি।

জোয়ান ছেলেরা মশাল হাতে খামারের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গানে টান দিচ্ছে কেউ। আবার কেউ-বা ডাকাডাকি করছে অনর্থক। আলি মির্জা সরকার, চোখ ঘুরিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। অনেক শব্দ তার কানে গেল। তার নাকটা তির্যক হয়ে উঠল একেকবার। চোখের তারা জ্বলজ্বল করে। আলোর দিক থেকে মুখ সরিয়ে এনে বললেন, এবার যে বড় তোড়জোড় লাগেরে! কি ব্যাপার!

ব্যাপার আবার কি অইব, সরকার চাচা! মনছুরালি কথা বলল, কওয়া তো যায় না কখন চোরচামাররা খেত সাবাড় কইরা যায়! সবই আল্লার রহমৎ, না অইলে অমন ধান পাঁচ

বছরের ভিতরে দেহি নাই।

হ্যাঁ। জবর ধান অইছে। বললেন সরকার, ঠিকই কইছস্, আল্লাহর রহমৎ।

সরকার মনে মনে হিসাব করলেন ভাগের অর্ধেক ধানে পাওয়া যাবে যে করে হলেও পনর হাজার টাকা। তার বেশিও হতে পারে। এই সঙ্গে কিছু যোগ করলেই চটকলের প্রাথমিক ব্যবস্থাটা হয়ে যায়। হুঁকোটা ফিরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন। সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, কালই কাডা লাগব নিহি ধান?

জ্বী হাঁ। কে একজন বলল, সব খেতই পাকছে।

তা অইলে তো মাড়াইর জায়গা ঠিক করন লাগে, কি কও তোমরা?

মজিদের গা জ্বালা করছিল। তার মনে হচ্ছিল, আসল কথাটা সোজাভাবে বলে দিলেই যেন লোকটার উপযুক্ত শিক্ষা হয়। কিন্তু নিজেকে দমিয়ে রাখল। ঠোঁট কামড়ে বলল, তা ঠিক করেন গিয়া, ধানকাডায় তো তিনচার দিনের বেশি লাগব না?

সে ভিতরে ভিতরে উপলব্ধি করে, তার মধ্যে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন। সবার চোখে পড়বার কথা নয়। অথচ সে জানে, ঠিক এমনটি আগে সে ছিল না। আজকাল যেখানে-সেখানে সে কথার তুবড়ি ফুটিয়ে বেড়ায় না। যখন যা বলে, ভেবেচিন্তেই বলে। তার চোখমুখ সবসময় দোয়েলের মতো চঞ্চল হয়ে ফেরে। গ্রামের কোন ঘটনা, কোন শব্দ তার মনোযোগ এড়িয়ে যায় না।

তার শ্যামল মুখমণ্ডলে একটা গাম্ভীর্য নেমে এসেছে।

খুব সকালে কাক ডাকার আগেই, সে বন্দরে চলে যায় কাজ করতে। সন্ধ্যার একটু আগে ফেরে। সারা গতরে ঘাম। ঠোঁটে পরিশ্রমের ক্লান্তি। তবু কর্তব্যের কথা ভোলে না। খাওয়ার পর একটু জিরিয়ে, খামারে চলে যায় সড়কি হাতে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে, আবার যায়।

সরকার চলে যাওয়ার পর, হঠাৎ কী মনে পড়ায় আজও যাচ্ছিল বাড়ির দিকে, তার চোখে সুদূরের ছায়া।

ঠিক বুঝতে পারে না সে, তার দেহমনে কেমন যেন একটা অন্তর্লীন মাদকতা। সেখানে দংশন নেই, অগ্নিক্ষরা জ্বালা নেই। কেবল অতল-স্পর্শ শান্ত গভীরতা। সেখানে সে ডুবে যেতে চায়, উধাও হয়ে যেতে চায় আপনভোলা বিহ্বলতায়। মমিনা হয়তো সাফসোফা পাতিলের পাশে পিঁড়িতে বসে তরকারির লবণ দেখছে, তার মুখ নিচু, কানের দুপাশে এলোমেলো চুল। কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে দেখে। বারবার টিকে ধরানোর অছিলায় কাছে গিয়ে বসে। কোনো উত্তেজনা নেই, কেবল একটা অজানা গভীর আনন্দে বুকের কড়াটা চিন্‌চিন্ করতে থাকে। ও কি বুঝতে পারে মনের কথা? অন্তরের কামনা? আমগাছের তলায় এসে সে থেমে গেল। সড়কিটা একটা গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ঘরটা দেখা যায় এখান থেকেই।

কিছুক্ষণ পর মমিনা হুঁকোটা জ্বালিয়ে নিয়ে হেঁটে এল। মজিদ হাত বাড়িয়ে নেয়, কিন্তু একটাও টান দিল না, গাছের গোড়ায় রেখে ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। ওর কাঁধে হাত রেখে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কী! কতা কইছ না যে!

কি কইয়াম। ম্লান হাসল মমিনা, বলল, কি আর কতা আছে!

মজিদ অনুযোগের স্বরে বলল, তুমি যেন সুখী অও নাই। অইবাই বা কেমনে, ঘরে

আইনা কষ্টই খালি দিলাম। একটা ভাল কাপড় দিতে পারলাম না! জেওরগুলাও বেচলাম!

তাতে তোমার কি দোষ! মমিনা বলল, তুমি তো—

না দোষ আমারই! মুখের কাছে মুখ দিয়ে সে ব্যাকুলস্বরে বলর, কিন্তুক তুমি বিশ্বাস কর মণি, ধান উটলেই তোমার জেওর আমি বানাইয়া দিয়াম। তোমার গা ছুঁইয়া কইতাছি। আমারে বিশ্বাস কর তুমি!

মমিনা নীরব, পরে তার লোমশ হাতটাতে নিজের হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে বলল, তুমি আমার একটা কতা হুনবা?

কি কও না। মজিদ বলল, জলদি কও।

বিনা জেওরে আমারে কি সুন্দর দেহায় না? কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার বুকের উপরে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে ও বলল, তুমি ভাবতাছ জেওর পাইলে আমি খুব খুশি অইয়াম, কিন্তুক তুমি জাননা, মাদুলিছড়া অহন আমার গলায় কাঁডার মতনই লাগব। তবু যদি তোমার মন না মানে, তা অইলে একটা কতা আমার রাখ! কি কও, রাখবা?

মজিদ ওকে আলিঙ্গনে ধরে শান্তকণ্ঠে জওয়াব দিল, কি কও না।

যে টাকা দিয়া অলংকার বানাইবা, তা আমরার পঞ্চায়েতের জন্য খরচ কর। আমি সব পঞ্চায়েতরে দিয়া দিলাম। তা করলেই আমি সুখী অইয়াম! আরও অনেক সুখী!

মণি! আমার মণি! মজিদ ওকে বুকে চেপে ধরল, তার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার।

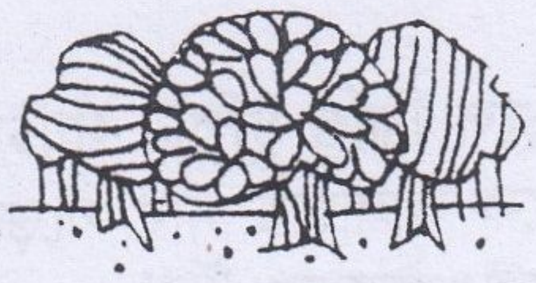
আমার পাতায় বাতাসের মৃদুধ্বনি। খামারের চারপাশে মশালগুলি আরো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্ষণে ক্ষণে ফুলকি উড়ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে নিমেষেই। ও কিনারা থেকে কে একজন চড়াগলায় ডাক ছাড়ল, পাহারা! হুঁশিয়ার!

ঠোঁট মুছে মমিনা বলল, অনেক অইছে! এবার ছাড়, ঐ তারা ডাকতাছে, জলদি যাও।

গাছের গুঁড়ি থেকে সড়কিটা হাতে তুলে মজিদ ফিরে চলল। মমিনা দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে কোলাহল ভেসে আসছে। ভেসে আসছে রাখালী সুরের গানও। কোমরে গুঁজে নিল কাঁধ থেকে পড়ে যাওয়া আঁচলটা, সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে কি একটা জোয়ারে, শিহরণে, এখনো যেন অবশ হয়ে আছে ঠোঁটজোড়া। দেখতে মিচিবিলাই, কিন্তু শক্তি কম না মরদটার। আবছা আঁধারে ওর মুখে একটা মধুর হাসির রেখা ফুটে উঠল।

শেষবারের মত দেখতে পেল, মানুষটা দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আর তার উঁচিয়ে-ধরা সড়কির ফলাটা ঝক্‌মক্‌ করছে মশালের আলোর আভায়।

জানুয়ারি, ১৯৪৯।



সুর্যা আঁকা

আকাশে মেঘেদের হুড়োহুড়ির বিরাম ছিলনা। বুনো হাতির পালের মতো দক্ষিণ থেকে দলে দলে উঠে এসে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে; চাপা আক্রোশে গজরায় আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-চমকানিতে অসাধু ইচ্ছার দন্তবিকাশ আচমকা। এরপর একটা সংঘবদ্ধ সংকল্পে ফেটে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ; নদীনালা, গাছপালা, ঘরবাড়ি, সবকিছুকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় পৃথিবীর অন্ধ আকর্ষণ থেকে।

একটু কষ্ট করলে এও সহ্যের সীমায়। কিন্তু এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কনকনে হাওয়া তাতে না যায় বাইরে বেরুনো, না আসে হাতে কোনকাজ। খেয়ালী প্রকৃতি কারো আপত্তিতে কান দেবার নয়; হি হি বাতাস বয়েই চলে। আমবন দুলিয়ে, ঘরের চাল নড়িয়ে সশব্দ দাপটে।

আবু জোহার কাণ্ডটা এই হাওয়ার মতোই বয়ে গেল সমস্ত গ্রামের ওপর দিয়ে। কেউ কাঁপল। আড়মোড়া ভেঙে বসল কেউ।

শুভাকাংখীরা তিরস্কার করল, আচ্ছা বলি তুই মানুষ না গরু। অমন সোনার মতন বৌরে তুই তালাক দিলি! ছি! ছি!

তবু এক তালাক, দুই তালাক অইলেও জোড়াতালি দেওন যাইত। একেবারে বাইন তালাক! গলায় দড়ি দা মরগা যা!

যদি শান্তি পাওয়া যেত বন্ধুদের অযাচিত উপদেশ নতমস্তকে পালন করতেও তার কোন আপত্তি থাকত না। কিন্তু মরেও যে তার নিস্তার নেই ; অশ্রুভারাক্রান্ত স্থির একজোড়া নয়ন তার আত্মাকে তাড়া করে ফিরবে চিরকাল। বনে বনে বসন্তের ফুল যখন ফুটবে একটুকু স্নিগ্ধ-সুরভি হাওয়ায় ভর করে এসে ব্যাকুল করবেনা তার কবরের দুর্বাকে, মাটির নীচে খটখটে কংকালটা শুনতে পাবে এক অন্তহীন করুণ কান্না—যেখানে সকল বাসনার, অবসান, সকল দাবীর মৃত্যু।

পাপ-পুণ্য সে বোঝেনা। বুঝতে চায়না। কেবল একটি নিরপরাধ প্রাণকে এই যে পা'য়ের নীচে দুমড়ে পিষে ফেলল—এ জিনিশটাই তাকে বারবার পীড়া দিতে থাকে। এক মুহূর্তের উত্তেজনায় এ কি হয়ে গেল!

মুখ তুলে ঠোঁট খুলতে গিয়েও কিছু বলতে পারেনা সে ; মনের অব্যক্ত ভাষা জ্যান্ত অজগরের মতো, কণ্ঠ অবধি ঠেলে উঠে শতপাকে ছড়িয়ে যায় ধমনী-তন্ত্রীতে। অতি কষ্টে সে ঢোক গেলে। তারপর মাথাটা বারকয়েক পিঁড়িতে ঠুকে মেঝের কাদাজলে পড়ে থাকে কুঁকড়ে।

বাইরে আমবনের শাখাগুলি একেকবার আছড়ে পড়ে সরসর শব্দে, গাছের নীচে ঝরাপাতার আর্তনাদ। বুকফাটা চিৎকারে আসমান ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে যায়, মেঘের শিখরে শিখরে বিক্ষুব্ধ সংঘর্ষের আওয়াজ। দুরন্ত হাওয়ার চাপে ককিয়ে ওঠে বেড়াগুলি, বিবর্ণ মুখ তুলে চায় আবু। ঘরের খুঁটিগুলি কি এতই শক্ত? একসঙ্গে সব ভেঙে পড়তে পারেনা মাথার ওপর? তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে পারে না?

অবশেষে থামে ঝড়বৃষ্টি, তিনদিনের আওয়াদানি শেষ। গোবরে শালিকেরা আমবনে আবার পাখা ঝাপটায়, চড়ুইয়েরা লেগে যায় বাসা মেরামতের কাজে।

সকাল হলেই একটা বিশিষ্ট লোকের আবির্ভাব যে বাড়িতে হবে তা আবুর অজানা ছিল

না। তার অনুমানে টের-বেটের নেই। কাঁচা-পাকা খসখসে চুলে কিস্তি টুপিটা সাঁটিয়ে দুপুরের আগেই এলেন সোনা মুন্সি, জায়নামাজে মাথা ঠুকে ঠুকে কালছিটে দাগ পড়েছে কপালে। তার পিটপিটে লালচে চোখে দুঃখীজনের প্রতি দরাজদীলের ঔৎসুক্য।

গত তিনদিন একবারও চোখ খোলেনি গুলনাহার খাতুন। রান্নাঘরে চাটাইর ওপর সেই যে দুমড়ে পড়েছিল তা থেকে ওঠবার সামান্য চেষ্টাও সে করেনি : আধ-সেদ্ধ ভাতের পাতিলটা উনুনের ওপরেই রয়েছে।

বাড়িতে ঢুকেই মুন্সি উঁকিঝুকি মেরে দেখলেন ঘরের আনাচে কানাচে। আবু উঠে বসেছিল। অর্থহীন ফ্যাকাশে দৃষ্টি দিয়ে সে চেয়ে দেখল লোকটাকে, তার নিস্পন্দ ঠোঁটে এতটুকু কম্পন জাগল না।

রান্নাঘরে গিয়ে তার আকাংখিত বস্তুটিকে পেলেন। পিঠে মৃদুহাত রেখে ধরা গলায় বললেন, আর পইড়া থাইকা কি অইব কও। সবই তগদির। সবই কপালের লেখা!

গুলনাহার ক্ষণেকের জন্যে চোখ মেলে চেয়ে আবার পড়ে রইল। তার শরীর একটুকু নড়লনা।

তোমরা যখন পয়লা আইলে এই গাঁয়ে—গলাখাকারি দিয়ে বলতে লাগলেন, আমি চোক বাইন্ধা থাকতে পারি নাই। গরিবরে দেখ্‌শোন্‌ করা হর মমিনের ফরজ। তখন তোমরার থাকার জাগা নাই, পেডে ভাত নাই! আমি জাগা দিলাম, তোমারে কাম দিলাম। অহনো কি আমি পরের মতো থাকতে পারি?

ও কাঁধে নাড়া দিয়ে সচেতন করে মুন্সি ভেজাগলায় বললেন, ওঠ, চল! আর পইড়া থাইকা কি অইব!

সোনা মুন্সির দরদ কেন উপবে পড়ছে গুলনাহার তা' ভালরকম বোঝে। তিনমাস ধরে সে তার বাড়িতে রাঁধা-বাড়ার কাজ করছে ; কারণে-অকারণে হেঁসেলে ঢুকে ফুচকি দিয়ে ওঠা তার নিত্যকার অভ্যাস। মাঝে মাঝে তো বলেনই—ওর হাতে নাকি মধু মেশান।—যেমন রান্নায় তেমনি তামাক সাজায়। কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে যেদিন সে তার কাছে যায় না, সারা বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে সেদিন ; ঝি-চাকরদের চৌদ্দ-গোষ্ঠির মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা হয়।

সাতদিন আগেকার একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। জোর ক্ষেত নিড়ানি চলেছে; রোজ পনেরোজন কামলার জন্যে ভাত-তরকারি ফুটিয়েও এতটুকু হাঁফ ছাড়ার ফরসুৎ নেই। তবু রান্নাঘরে তলব পড়ে তামাকের। গুলনাহারের গা-টা রী রী করতে থাকে, বুড়োটাকে দু'কথা আচ্ছা করে শুনিয়ে দিলে কেমন হয়? ফুলুর মা'কে ডালের লবণ চাখতে দিয়ে সে যায় হুঁকো জ্বালিয়ে দিতে।

মগরেবের নামাজ শেষ করে বসে বসে তসবিহ জপছেন কামরাটা মূলঘরের ভেতরই, একপাশে। পাঠশলার বেড়া দিয়ে তাকে সকল রকম জাগতিক কোলাহল থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে। কর্তা ছাড়া সেখানে মাথা গলাবার অধিকার কারো নেই ; এমনকি প্রৌঢ়া সহধর্মিণীরও নয়। কেবল সকাল-বিকেল দু'বার ঝাট দেয়াটা চলতে পারে। জায়নামাজের শিয়রে গবগবে ধোঁয়ার ফুসকি উড়িয়ে জ্বলছে কেরাসিনের কুপিটা। ভেতরে ঢুকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল গুলনাহার।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দেবার ঝাঁজটা তখনো ওর ছিল। কি বলবে তা মনে মনে বানিয়েও রেখেছিল ; কিন্তু সামনা-সামনি হতেই সাহসে কুলালনা ; উনি বিরূপ হলে মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও হারাতে হবে।

হুঁকোটা দিয়ে সে হাত ফিরিয়ে আনতে পারলনা ; বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে খপ্‌ করে ধরে ফেললেন। এ-সময় বাড়ির সবাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত। এদিকে আসবেনা

কেউ। আসবার নিয়মও নেই।

এসব ঘটনা মনে করে আর ফায়দা হবেনা কোন। নেকড়ের মতো আঁচড়িয়ে খামচিয়ে কাপড়চোপড় তছনছ করে ফেললেও সেদিন শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পেরেছিল নিজেকে। কিন্তু এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। ভেতরে যা-ই থাক্ যেতেই হবে তার বাড়িতে। মনের আগুন বাদলা বাতাসে দপ্ করে যদি নিবেও থাকে, পেটের আগুন তো আর নিবেনি।

ধীরে চাটাইয়ে উঠে বসে অর্থহারা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গুলনাহার। বৃষ্টির ছাটে আর ছিটকানো কাদায় চুলগুলি লেপটে একাকার। সুডৌল হাতটায় ঘরকন্নার কালির দাগ এখনো রয়েছে। নীলচে কাচের চুড়িগুলিতে সস্তা দামের সেফটিপিন সাটানো। আবু জোহা এনে দিয়েছিল শেওলাকান্দির আরঙ থেকে। কানে ঝুম্‌কি-দেওয়া কেমিক্যালের দোল দুটোর রঙ নিষ্প্রভ হয়নি ; মাসখানেক আগে গায়েনীর কাছ থেকে নিয়েছিল ছ'আনায়।

দুয়ারের কাছে ফুলুর মা দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। কর্তার চোখ-ঠারানো ইংগিতে বিরাট বপুখানা দুলিয়ে কাছে এল।

তুই ধইরা নিয়া আ! দাড়িতে আঙুল ঘষে বললেন সোনা মুন্সি, তিনদিন না-খাওয়া! এক্কেবারে আধখান্ অইয়া গেছে গা। বাড়িত নিয়া ভালমত খাওয়াইবি, বুঝলি? অহঁন তার কাম করার দরহার নাই। তুই নিয়া আ, আমি যাই, একটা জরুরি কাজ আছে!

মুন্সি বেরিয়ে গেলে ফুলুর মা বোকা বনে যায় একদম, কী কথা বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে তার কূলকিনারা করতে পারে না ; যদি বলত না -হয় ঘন্টাখানেক বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে দিত পারত ওর জন্যে। কোন দিশবিশ না পেয়ে নিজের কাপড়ের আঁচলে ওর মুখটা সযত্নে মুছে দিল, বলল, ওঠ্‌ল, যাই!

রান্নাঘরের ওপরে ডালপালাসমেত নতুন পাতা-দোলানো কামরাঙা গাছটায় ছন্নছাড়া কাকেরা কা-কা জুড়ে দিয়েছে। তিনদিনের বাদলায় তারা উপোস ; তার ওপর আজ সকাল বেলাকার বরাদ্দ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। পান্তাভাতের দু'তিন মুঠো পেত অন্যদিন, নাস্তাটা শাহী হালেই চলে যেত হয়ত। তাদের মধ্যে অতি খাই-খাই কয়েকটা খিড়কি দিয়ে বারকয়েক উঁকিঝুকি দিয়ে গেছে। চিরাচরিত নিয়মে কোথায় হঠাৎ ছেদ পড়ল তা যেন ঠাহর করতে পারছেনা কোনমতেই।

আমগাছের পাতার ফাঁকে রাঙা-রোদ ঝলকে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে উঠোনের কাদায়। পাতিহাঁসদুটো কোন লোভনীয় লিকলিকে শিকার আয়ত্ত করার চেষ্টায় সেখানে প্রাণান্ত। আবু সেদিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

একটু পরেই সে দেখতে পেল, দুটো মেয়েমানুষ ছোট ছোট পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার শরীরটা বিদ্যুৎ-পিষ্টের মতো ঝাঁকানি খেয়ে উঠল, ডানহাতটা বাড়িয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠতে রইল সে।

কিন্তু পরক্ষণেই হাতটা শিথিল হয়ে গেল। শিরা-উপশিরার রক্তকণিকাগুলি নিমেষের জন্যে ফুঁসে উঠে যেন বরফের মতো জমে গেছে। তার ঠোঁটে অস্পষ্ট বিড়বিড়, যাক্! চাইনা আমি, চাইনা!

তবু কেন এ দুর্বলতা? তার বুকের ভেতরটার একটা নির্জন অংশ ফোয়ারার আকস্মিক উচ্ছলতার মতো একেকবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে ওঠে। কোন যুক্তি, কোন কুয়াশার আবরণ মানে না ; সেখানে বোঝাপড়ার স্থান নেই, শুধু এক নিবিড় অনুভূতির একটুখানি অকৃত্রিম ছলছলানি। সত্যি সে তাকে ভালবেসেছিল সমগ্র সত্তার বিনিময়ে ; এতটুকু ফাঁক, এতটুকু অস্পষ্টতার বুদবুদ ছিল না সেখানে। পাওয়া সেখানে একান্ত করে পাওয়া।

প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় আর রোমাঞ্চ সেখানে ছিল না ছিল দিনে দিনে একাত্ম হয়ে ওঠার গভীরতা। ছোটবেলা থেকেই সে বছর হিসেবে কামলা খাটত তাদের বাড়িতে ; তারা ছিল সম্পন্ন গেরস্ত পরিবার। প্রতিদিন সকালে নাশতা নিয়ে খামারে যেত গুলনাহার। সারা মাঠের ওপর কুয়াশা ঝুলতো, সকাল-সূর্যের আলো ভেঙে ভেঙে পড়তো মৃদু হাওয়ায়। মাটিমাখা অপরিচ্ছন্ন হাতটা ধুয়ে সে বসে যেত আলের দুর্বার ওপর। তার শ্রান্ত ঠোটে পরিতৃপ্তির হাসি।

কৈশোরের চাঞ্চল্য শান্ত-গম্ভীর রূপ নিল যৌবনের পুষ্প লতায়। গুলনাহার বন্দী হল ঘরের ঝাপের আড়ালে। এরপর থেকে সামনা-সামনি দেখা হতনা সত্য ; তবু একজোড়া সূর্মা-আঁকা সুন্দর চোখ আড়ালে-আবডালে অদৃশ্য পরিচর্যায়, তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলল একটা অনিবার্য সত্যের মতো।

সেজন্যেই সে তার ধারণার ত্রিসীমায়ও আনতে পারেনি, দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি আছে যা' তার কামনার ধনকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিতে পারে। অথচ তাই হতে চলল একদিন। তার চরম ফয়সালাও এক লহমার বেশি সময় নিলনা। একদা অমাবস্যার রাত্রে সবাই যখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে, ঘরের পেছন দুয়ার খুলে, পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে, অতি সন্তর্পনে জাগাল গুলনাহারকে। অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্ কথা পাকাপাকি করে নিল।

তার দৃঢ় বিশ্বাস, সারা গ্রামে অন্তত একটি লোক তাদের মনকে বুঝবেন, পাশে এসে দাঁড়াবেন ; আর তিনি হচ্ছেন মির্জা ইউসুফ।

তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হল। আজীবন মৌলানা রুমীর ভক্ত প্রেমধর্মের মূর্তপ্রতীক মির্জা ইউসুফ দুতিনজন শিষ্যের অনাড়ম্বর জলসায় পরস্পর হাত মিলিয়ে দিলেন তাদের। তখন দুপুর-রাত। পাড়া-পড়শী কেউ জেগে ছিলনা।

আজ যদি তিনি কাছাকাছি থাকতেন! একটা ক্ষীণ আশার স্ফুলিংগ আচমকা ঝিলিক মেরে যায় তার জমে-যাওয়া মনের পাথরটায়। তাকেই আঁকড়ে ধরে সম্ভাবনার জাল বুনে যায় তার কল্পনা। আজ যদি কাছে থাকতেন মির্জা ইউসুফ—তাহলে কিতাব ঘেঁটে ঘেঁটে কোন সূত্র বার করতেনই, যা দিয়ে আবার পাওয়া যাবে গুলনাহারকে-আবার, আবার!

এতক্ষণে রোদ মাথার ওপর উঠেছে, তিনদিন মুখ বুজে থাকার পর সকল ঝাঁজ যেন উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে। বাঁশের খুঁটিভরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আবু। মুহূর্তের উত্তেজনায় যে তিনটি শব্দ সে উচ্চারণ করেছে তাই কি তিনটি অব্যর্থ গুলি হয়ে এতদিনকার সমস্ত সম্বন্ধকে নিহত করবে? হৃদয়ের চাইতে অনুশাসনটাই কি বড়? একমাত্র বিবেচ্য? দিনে দিনে, রাতে রাতে দারিদ্র্যের মাঝেও অসংখ্য উজ্জ্বল মুহূর্তের আলোবাতাস, গ্রহণ করে যে বিশাল বৃক্ষ ফুলেফলে শাখা প্রশাখায় মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, ক্ষণিকের ঝড়ে তা শিকড়শুদ্ধ উপড়ে যেতে পারে না।

দু'পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় আবু জোহা।

গলা খাকার দিয়ে মুন্সি দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালেন ; ব্যাপারটার ওপরে অনেক খোশগল্প করে এসেছেন ঘরে ঘরে তার স্পষ্ট স্বাক্ষর চোখেমুখে লেগে রয়েছে। মুখ একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, যা যা এ বাড়ি থে বার অইয়া যা। তোর মতন আস্ত শয়তানরে আমি আর জাগা দিতে পারি না। দর্জাল কোথাকার! এইক্ষণে বার অইয়া যা তুই।

একটা বন্য হিংস্রতা ঝলকে যায় আবু জোহার চোখের তারায়। লোকটার ওপর সিংহের মতো লাফিয়ে পড়ে দাড়ি মোচগুলি ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয়, মাথাটা ফাটা বেলের মতো ভেঙে দিতে কাঁঠালের গাছের গুঁড়িতে ঠুকে ঠুকে।

তবু সে কিছুই করতে পারে না। ভেতরে ভেতরে কেবলি গজরাতে থাকে। লোকটার

কাছে নত না হয়ে উপায় নেই এখন।

সামনের দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ ভেঙে পড়ে উচ্ছ্বাসে, ভাঙা গলায় কঁকিয়ে ওঠে, আমারে বাঁচান মুন্সিসাব, আমারে বাঁচান! ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারুম না! বাঁচতে পারুম না!

বটে!

আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাকে তালাক দিতে চাই নাই। ঘরে চাল ছিলনা, বারবার পীড়াপিড়ি করতে ছিল, আমার মাথা চইড়া গেছিল!

দুহাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠল আবু জোহা। কপালের বলিরেখায় বিরক্তি জাগিয়ে মুন্সি বললেন, অহন আর সময় নাই। তবে হ্যা শাদী তুই আবার করতে পারিস, পাত্রী রাজি অইলে। তাও আবার শরামতে আগে অন্য একজনের লগে তারে বিয়া দিতে অইব। অনেক হাংগামা।

তাতেও আমি রাজি! আহত পশুর মতো কাতর দৃষ্টিতে চাইল আবু জোহা। তবু যদি একটু করুণার আভাস সে পায়!

মুখ ভেঙচিয়ে একটা দুর্বোধ্য বাক্য উচ্চারণের পর মুন্সি চলে গেলে সমস্ত বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তার মন হুহু করে কেঁদে ওঠে। সে দিনমজুর, রোজ আনে রোজ খায় ; তবু এমনভাবে কোনদিন কারো কাছে তার মাথা নত হয়নি।

কাস্তেটা বেড়ায় গোঁজা রয়েছে। বাইরে বেরুলে কাজ মিলতেও পারতো, বৃষ্টির পর রোদে রোদে যে-সব ক্ষেতে একটু টান ধরেছে সেগুলি নিড়ানোর জন্যে গেরস্তরা কামলা না নিয়ে পারবেনা। কিন্তু কাস্তে হাতে নিতে অক্ষম আজ।

চোখমুখ ধুয়ে বিকেলের দিকে আবার মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল বারান্দায়। উঠোন পেরিয়ে ফুলুর মা'কে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল।

তিনদিন ধইরা উপাস। নেও দুইডা দানা মুখে দেও। কাপড়ের আড়াল থেকে কলার পাতায় ঢাকা একটা সানকি বের করল ফুলুর মা। তাতে ভাত ও কিছু তরকারি।

তুমি কইথে আনছ এগুলি।

যেখান থে-ই আনছি। তোমার তা দিয়া কোন কাম নাই। নেও খাও।

আবু বলল, না আমার ভুখ নাই।

এবার ফুলুর মা বিরক্ত না হয়ে পারলনা। হাতটা নেড়ে বলল, নেও আর ন্যাকামি কইরো না। ভুখ যে নাই আমার তা ভালা কইরা জানা আছে।

আমি না খাইলে তোমার কি?

আমার আবার কি। একটু থেমে সে জওয়াব দিল, তোমরারে নিয়াই তো যত হয়রানি। ওদিকে একজন গোঁ ধইরা আছে। তুমি না খাইলে দানাপানি মুখে দিবনা।

হঠাৎ আঁৎকে উঠল আবু জোহা। যন্ত্রচালিতের মতো মুখ ঘুরিয়ে বলল, কি কইলা?

কথা ঘুরিয়ে ফুলুর মা বলল, আমি আর কইবার কে? আমারে মানা কইরা দিছে বারে বারে!

না বললেও বুঝতে এতটুকু দেরি হয়না আবু জোহার। তাহলে সে-ও ভাবছে তার কথা? এতবড় আঘাতের পরও তাকে ক্ষমা করতে পেরেছে? গালাগাল দেয়নি? তার বুকের ওপর মাটি উঠুক, এ চায়নি?

নখ খুঁটতে খুঁটতে সে বলল, খুব কষ্ট পাইছে, নারে?

পাইব না? ফুলুর মা ঝংকার দিয়ে উঠল, তুমি কি মানু? একটা আস্ত আজরাইল!

—ঠিক কইছ, আমি মানু না!

সন্ধ্যার শালিকদের কিচিরমিচির কাকলীর সঙ্গে তার অনুতাপ-ভেজা স্বীকারোক্তি জড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমবনের ঈষৎ ভেজা পত্রগুচ্ছে বিদায়ী সূর্যের রাঙা-রশ্মি অনেকক্ষণ ধরে ঝিলমিল্

করতে লাগল স্বপ্ন-ভাঙা কারুণ্যের মতো। ফুলুর মা'কে কাছে বসিয়ে করুণস্বরে কি বলল আবু জোহা, ওর মাংসল মুখের থলথলে সমবেদনাকে আড়াল করে রাত্রি নেমে এল।

কিছুদিন পর আরো একটি থমথমে রাত্রি এসে পৃথিবীর মুখ ঢেকে দিল।

জলসা বসেছে বৈঠকখানায়। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সোনা মুন্সির অপূর্ব সমাবেশ। আগরবাতির ভুরভুর সুবাসে আমোদিত বাতাস নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে উজ্জীবিত করে তুলছে সবাইকে। ফরসি হুঁকোয় তামাক পুড়ছে সমানে, বাক্সে তুলেরাখা পিতৃপুরুষের চোগা-চাপকান পরে, প্রথম বিয়ের তৈলজীর্ণ পাগড়িটা মাথায় চেপে, জরির কাজ-করা মদীনার আলোয়ান গায়ে আবির্ভূত হলেন।

ধনু মোল্লা বলে উঠল, মাশাল্লা!

সোনা মুন্সির যেন বিরক্তির অন্ত নেই। কপাল কুঁচকে একজনকে ধরে, তিনি বললেন, বুড়া বয়েসে যতসব ফ্যাসাদ আর কি। শয়তান ছোঁড়ারা কথায় কথায় বৌরে তালাক দেয় আর ঝক্কি নিতে হয় আমাকে! হুঁ। আমি যদি না আগাইতাম, যাদু দেখত মজা, কেমন কইরা বৌরে আবার পায়!

আহা চুপ করনা! শিখ দাড়িওলা জামাল প্রধান শাসিয়ে উঠল, বিয়ার দিন অত কথা কইতে নাই।

লজ্জিতভাবে মাথা নত করে চুপ হয়ে গেলেন। ভুলেই গিয়েছিলেন একদিনের জন্যে হলেও তিনি এখন দুলহা বৈকি।

আজকে ভোররাতে খিড়কির বাতাসে যখন দাড়িগুলি নড়ছিল, তখন এক খোয়াব দেখেছিলেন, দেখেছিলেন, তিনি যেন ফেরদৌসের এক গুলবাগে বসে আছেন শ্বেত পাথরের ওপর। সোনালি পাখা নেড়ে বুলবুলিরা শিষ দিচ্ছে, পুচ্ছ নাড়ছে ; নীচে কুলুকুলু শব্দ করে বয়ে চলেছে আবে কওছরের স্বচ্ছধারা ; এমন সময় ঝলমলে শাড়ি পরিহিত অনিন্দ্যসুন্দরী এক হুর চকিতচরণে সামনে এসে তার গলায় পরিয়ে দিল মোতির মালা। গদগদ আবেগে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই ভোজবাজির রূপকুমারীর মতো মিলিয়ে গেল।

খোয়াবের মধুর আমেজটুকু মনের তারে জড়িয়ে সকালে নাপিতের সামনে বসেছেন, দাড়িগোঁফ ঝকঝকে করিয়েছেন। এরপর কামরায় ঢুকে পারদ ওঠা পুরানো আয়নায় মুখখানা বারবার করে দেখেছেন। না, একটা জোয়ান মেয়েকে বশ করার শক্তিসামর্থ্য এখনো তার আছে।

পাগড়ি মাথায় বসে এখনো এমনি একটা কল্পনা ঘোরপাক খাচ্ছিল মগজের সীমানায়। একটি মাত্র রাত্রি। এরপর যার জিনিশ তাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। কাজেই নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা সময়ের উসুল নিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। গুলনাহারের আবরণ মুক্ত সুপুষ্ট দেহটা ভেসে ওঠে আবছা চোখের তারায়।

বরপক্ষের উকিল কথা কয়ে উঠল। বলল, আর দেরি কইরা ফায়দা নাই। কি বলেন জামাল প্রধান?

হ্যাঁ, ঠিকই। শুভকাম শেষ করাই ভালা।

ব্যাপারটা মনেপ্রাণে সমর্থন না করলেও পাড়া-পড়শী অনেক মেয়েই এসেছে দেখতে। হৈ চৈ করছে রান্নাঘরের কাছ ঘেঁষে। সামান্য মিষ্টিমুখ করানোর ব্যবস্থা হয়েছে, অনেকেরই নাকে এসে লাগছে ফিরনীর গন্ধ।

ওদিকে ঘরের ভিতর একটা শাড়ি নিয়ে ফুলুর মা প্রাণান্ত হচ্ছিল। কিছুতেই পরতে

চায়না গুলনাহার। একেকবার নাগিনীর মতন ফুঁসে ফুঁসে ওঠে।

আহ্, তোর একটুও আক্কেল নাই? ও হয়ত তৈরি অইয়া খাড়ইয়া আছে। শিগগির কইরা পইরা নে! সব ঠিকঠাক! প্রায় জোর করে ধরে শাড়িটা পরাতে থাকে ফুলুর মা। তার হাতে পায়ে অসম্ভব ব্যস্ততা।

খোশ মেজাজে হুঁকোর নলটা ফিরিয়ে দিয়ে উকিল সাহেব উঠলেনা, দু'জন সাক্ষীও তার অনুকরণ করল। কথাবালা বন্ধ করে, না হয় ফিসফিসে নামিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসল জলসার সবাই। কাজটা শেষ হয়ে গেলেই তস্তরির আগমন সুনিশ্চিত। ঝাপসা চোখ যথাসম্ভব চকচকে করে আকাংখিত মুহূর্তের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সোনা মুন্সি।

রাত আটটার বেশি হয়নি।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ভেতর-বাড়িতে হৈ চৈ উঠল। গোলমালটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে চাক-ভাঙা মৌমাছির মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়িতে। বৈঠকখানা ঘরও তা' থেকে বাদ যায়নি। কতক্ষণ একসঙ্গে সবাই উৎকর্ণ। এরপর সমাগত মেহমানরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে একসঙ্গে জিগির দিয়ে উঠল, কি অইছে? কি?

প্রশ্ন প্রশ্নই রইল। কেউ কোন হদিস দিতে পারলনা। উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলেন সোনা মুন্সি। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, আমার বাড়িতে একপাল শূয়রের আড্ডা। কাল এগুলানরে ঝাডাইয়া বার করুম! বুঝছে কি!

দু'জন সাক্ষী হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল ঘরে। এরা যেন লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে শিবিরে এসেছে সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে ওরা। কেউ কিছু জিগগেস করার আগেই একজন বলল, কইন্যা নাই!

কইন্যা নাই? কয় কিরে বাবা! হুঁকোর নলটা অজান্তেই ছেড়ে দেয় জামাল প্রধান।

খুন করুম্! একটা একটা ধইরা খুন করুম্ আমি! সবাইকে হকচকিয় দিয়ে মুন্সি লাফিয়ে উঠলেন ; পাগড়িটা হাতে আঁকড়ে ধরে ডাংগুলির মতো ছিটকে গেলেন ভেতর বাড়িতে। সবাই তালগোল পাকিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করেছে। মুন্সি আবার চেঁচাতে লাগলেন, খুন করুম্! সাড়ে বার টেহায় কিনা শাড়ি। খুন করুম্!

আরেক খিলি পান মুখে ঠেসে চুপচাপ বসে রয়েছে মুন্সি গিন্নি। বাড়িতে যে এতকিছু হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কান দেবার প্রয়োজনই যেন নেই তার।

তুই ক'! জানের মায়া থাকলে ক' তুই, কই গেছে! ফুলুর মার কাঁধে চাপ দিয়ে মুন্সি ধমকাতে লাগলেন, তুইও তো ছিলে ঐ ঘরে।

আমি রান্নাঘরে গেছলাম। ফিইরা দেখি নাই! এর বেশি ফুলুর মা কিছুই বলল না।

ততক্ষণে আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কয়েকগণ্ডা লোক। সবাই ছুটোছুটি করছে। মুরগি টঙের ভেতর, দরজার আড়ালে, ধানের জাবারে, পায়খানায় বাতি উঁচিয়ে দেখল, কোন আওরতের মাথার একটি চুলও পাওয়া গেল না। তোলপাড় করা হল ঝোপঝাড়, বাড়ির পেছনকার জলজঙ্গল। কিন্তু সবই বৃথা।

মেয়েটা কই গেছে কেউ বলতে পারলনা। কেবল খেয়াঘাটের মাঝির ভাগ্যে রাত্রির মতো আরেকটা কাজ জুটে গেল। নাওটা ওপারে ঠেকিয়ে সে দেখতে পেল, দু'আনার পয়সা গণে দিয়ে একটা মেয়ে আরেকটা পুরুষ ত্রস্তপায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বাতি



উনুনের পাশে জড়ো করা শুকনো কাঁঠাল-পাতার ওপর দুমড়ে বসে মিঠে আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কাঁদছিল বিনিয়ে বিনিয়ে। কান্নার মতো হলেও ঠিক কান্না এ নয়। গোছা গোছা দিশি পাটের মাতা শাদা চুল, তেনা হয়ে যাওয়া খয়েরি কাপড়, চওড়া কপালে কোঁচকানো ভাজ-ছানিপড়া চোখের চাউনিতে মাটির দিকে চেয়ে আপনমনে গুনগুন্ করা, আর একটু পর পর হাউমাউ করে ওঠা, যা কথায় না আছড়ে শেষ হয় কাতরতায়। গলার স্বরে একটুও জ্বালা নেই। থেতলাতে থেতলাতে থেমেছে এসে এক জায়গায়। বহু ব্যবহৃত পুরনো জুতোর সোলের মতো মুখখানা বিষাদভরা নির্লিপ্ততায় এমন রুক্ষ হয়ে উঠেছে যে, তার আঁসুতে ঝাপসা মণিজোড়া ভিজে ওঠার আগেই বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

অষ্টপ্রহর এই অবস্থা।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে নাওয়া খাওয়া, দুপুরে গাঙের ঘাটে গোসল করতে যাওয়া, সংসারের টুকিটাকি কাজ করা, আর অনেক রাতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার পূর্ব ইস্তক তার অধ্যবসায়ে শৈথিল্য নেই। কোন কোন সময় বিড়বিড় করে ঘুমের ঘোরেও। এ অবস্থায় যে-কেউ ভাবতে পারে, কাঁদনটা বুঝি শিলপাটায় পান ছেঁচে খাওয়ার মতোই তার একটা অভ্যাসমাত্র।

কিন্তু আসলে তা নয়। পিরিজকান্দি গ্রামের সবচেয়ে পাষাণপ্রাণ মেয়েলোক বলে তার সুনাম, পিয়ারা বুড়োর ইন্তেকালের সময় অশ্রুপাতের চেয়ে গাঙের বাঁক থেকে হাঁসগুলো খুঁজে আনার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেছিল বেশি ; আকালের ধাক্কায় একমাত্র পুত্র যখন কংকালসার হয়ে মারা যায় তখন একফোঁটা চোখের পানি ফেলতেও সংযম দেখিয়েছে। এ-হেন মহিয়সীর এমন হাল তখন তা কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

এতদিনে তার কারণটা কারো জানতে বাকি নেই।

প্রথম প্রথম অনেকেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতো। বলতো, আচ্ছা কও তো, বোকামি করতাছো না? আটকা পইড়াছে তাতে অত কান্‌বার কী আছে? হে তো আর চুরি ডাকাতি কইরা জেলে যায় নাই?

হ। তাতো বুঝি। তবু মনডারে তো বুঝ্ দিতাম্ পারি না! আমার একটা বলতে একটা নাতি, কানা চোখের পানি। হে ছাড়া বংশে বাতি দেওনের লোক নাই। এই কতাডা তো ভুলতে পারি না।

ঠিক কইছো। তবু শহীদ তো একলা না, তার লগে আরও অনেক মার পুতেরে ধইরাছে। তারার অবস্থাডাও একবার ভাইবা দ্যাখো।

দেখ্ছি। কিন্তুক কতা অইলো মিছামিছি কেন ধরবো, জেলে ভরবো, জুলুম করবো? দেশে মানুষ নাই, বিচার নাই?

মানুষ আছে। আর কিভাবে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হয় তাও হয়তো তাদের অজানা নয়। তবু শেষ পর্যন্ত সকল আক্রোশ গিয়ে পড়ে বৌয়ের ওপর। নাতির জীবনটা যে ধ্বংস হতে চলেছে সে জন্যে তার জননীই নাকি একমাত্র দায়ী। সে-ই সোহাগ করে ছেলেকে পাঠিয়েছে শহরে, গয়নাপত্র খাট-চৌকি বিক্রি করে কলেজের খরচ যুগিয়ে এসেছে। নিজেরা একবেলা খেয়ে না খেয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে মাসের আগাম। এ-সবে

বুড়ির স্নেহমেশা তিরস্কার হরদম লেগেই ছিল, হোস্নাবানু সেদিকে কোনদিন কানও দেয়নি। ছেলে পড়ছে এ যেন তার কাছে এক খুব বদ দোয়া। এক আচানক তাই গাড়িতে ওঠার জন্যে ইস্টিশনে যাওয়ার পথে আলম প্রধান যখন অনেককে শুনিয়ে ঠিশারা করেছিল, হো হো হো! ব্যাঙের আবার চার ঠ্যাং! গাড়ি গাড়ি টেহা নিয়াও রহিম মুন্সিরা চোদ্দপিড়ি লেহাপড়া করতো পারল না, আর ফহিরনীর পুতের ফহর দ্যাহ! পড়তো যায় টাউনে। দেইখো মালুম অয় তিন দিন বাদে যদি ফিইরা না আসে, আমার আতের তালু দিয়া বটগাছ জ্বালাইব।

তখনও জওয়াব দেয়নি। তার চোখে যে বিরাট স্বপ্ন। ছেলে মানুষ হবে, দেশের কাজ করবে, তাদের দুঃখ দুর্দশা আর থাক্‌বেনা। পুঁথির কাহিনীর সেই বাতিওলার মতো পথে পথে বিলিয়ে ফিরবে আলো।

আলম প্রধান আজকাল ইচ্ছে করেই গায়ের ঝাল মেটাতে আসে। বিনা আপ্যায়নে বারান্দার জলচৌকিতে বসে যায়, আর প্রথমশ্রেণীর বেকুপের মতো শরীর ঝাঁকিয়ে হাসতে তাকে। সে হাসি অবশ্য একেবারেই নিরর্থক নয়। তার কাছে এর উল্লাস গাঁয়ে গাঁয়ে বদনাম রটিয়ে বেড়ানোর চেয়ে জোরালো।

—দ্যাহ বুড়ি! কাণ্ড দ্যাহ তোমার নাতির!

দাদিমা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

প্রধান বক্‌তে থাকে, কতায় বলে পিঁপড়ার পাখা ওডে মরণের তরে। ডাহের কতা মিছা না। এক কলম লেহা হিক্‌ছে আর তার গররিতে পঙ্‌খী ঘর লয় না। অহন জেলে ভরছে, খুব ভালা অইছে, না?

যা অইছে, তা অইছে। তোমার কি? যাও।

আলম প্রধান খ্যাক্‌খ্যাক্‌ করে হেসে ওঠে। রসিয়ে রসিয়ে বলে, আগো অত চেত্‌ কিয়ের? ভালা কতা কইতাছি তা বুঝি গতরে সয় না! লোকের কতায় আমার রোকিয়ারে যদি তার আতে দিতাম তা-অইলে অহন উপায়ডা কি অইতো! অহন আমি জামাই পাইছি ফেরেশতার মতন, নাইবা জানলো লেহাপড়া, মাসে পাঁচশো টেহা কামাই করে।

দাদিমা তেড়ে ওঠে, দ্যাহ পরধান এহানে আর আইও না বক্‌বক করতে। তোমার কতা হুনতাম পারি না!

তা পারবা কেরে? আঁতে ঘা লাগে তো!

এইভাবে আলম প্রধান মিটিয়ে যায় তার অন্তর্জ্বালা! বিলাত পাঠাবার লোভ দেখিয়েও শহীদের কাছে তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনি, সে-অপমান কি সহজে ভোলা যায়? এ লোকটার চেহারাই দেখতে পারেন না হোস্নাবানু, বাড়িতে পা দিলেই নানান কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। ভাঙা কাঁচের মতো কথার ছিটেফোঁটা তার কানেও বেঁধে। একটুখানি থমকে গিয়ে হয়তো শোনে, তার চিন্তায় উজ্জ্বল সূত্রে একটুখানি টানও লাগে কোন কোন সময়, তবু দমে যায় না তার বুক। তার স্বপ্ন যে এখনো মরেনি, অনেক বিনিদ্র রাতের বিন্দু বিন্দু আশ্চর্য অনুভূতির রক্তমাংসে সে গড়া।

সেই সব রাতগুলো জীবন্ত হয়ে আছে।

শহরে যাওয়ার মাস তিনেক পর শহীদ যখন বাড়িতে আসে তখন তার চোখমুখ দেখে প্রথম অবাক হয়ে যায়। সে সরল মুখাবয়ব আর নেই। একটা অনমনীয় দৃঢ়তা তার চিবুকে দীপ্ত হয়ে রয়েছে। যেন বদলে গেছে তার গলার স্বরও, সেদিন আকুলকণ্ঠে জিগগেস করেন. কি রে, অমন অইয়া গেছস?

কেমন? হেসে জওয়াব দিল শহীদ।

কেমন! গাল-মুখ যে শুহাইয়া কাঠ!

ও এই! আমি তো মনে করেছিলাম, না জানি কী ভীষণ ব্যাপার!

তুই তো হাসতাছস। একবার মুখটা দেখতো আয়নায়, নিজেরে তুই চিনতে পারস কি না! অনুযোগ মিশ্রিত ব্যাকুলতা উপচে পড়েছিল হোস্নাবানুর কণ্ঠ থেকে।

একটু চিন্তা করে শহীদ বলল, আমার মুখ কি দেখবো মা! তোমাদের মুখগুলার দিকে একবার চেয়ে দ্যাখো তো! তোমার মুখ, দাদির মুখ, গাঁয়ের সব মানুষের মুখ! মুখগুলি কি আগের মতই আছে?

এ কি কস্ তুই!

সেদিনই তার মনে সন্দেহ জেগেছিল, ছেলের একটা কিছু হয়েছে। তার চারপাশে যেন একটা নতুনের গন্ধ। ছোঁয়া যায় না। একান্ত অনুভবে মনটা কেবল ছল্‌ছল্ করে ওঠে। একটু ভয় না হয়েছে এমন নয়, তবু থেকে থেকে কেবলি একটা আনন্দ-স্নাত বেদনা সত্তার কণায় কণায় প্লাবনের আর্দ্রতা এনে দিয়ে গেছে।

ক্রমে রাত হয়েছে। ধীরে ধীরে শান্ত চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে, নদীর নিস্তরঙ্গ জলে মিলে গেছে বাঁশঝাড়ের সুদীর্ঘ ছায়া। তালবনে বাদুড়ের পাখা ঝাপটানিও স্তব্ধ। থেকে থেকে নিশাচর পাখির আচমকা ডাক ঘুমন্ত পৃথিবীর জানালায় বিদ্রূপ হেনে গেছে। তারই শব্দে হয়তো অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেছে হোস্নাবানুর। পাশ ফিরে চোখ কচলিয়ে দেখেছে, উত্তর-ঘরের ইখরের বেড়ার ফাঁকে তখনো বাতি জ্বলছে। এক ফালি হারিকেন-আলো কাঁঠালি-চাঁপার ঝোপ থেকে চাঁদের আলোকে দিয়েছে সরিয়ে। আর ঘুমোতে পারেনি। তন্দ্রার আঁশ একে একে কেটে পড়েছে চোখের তারা থেকে, পাতা থেকে। ত্রস্তপদে উঠে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছে বেড়ার ফাঁকে।

কিরে! অহনো তুই জাগ্‌না?

ও মা! খুব রাত হয়েছে, না?

বুঝতাছি। পাগল না অইয়া তোর নিস্তার নাই। অত রাত অইছে তবু জাইগা জাইগা পড়া, এ মানুষের মাথা না আর কিছু!

শহীদ হেসে উঠেছে তার কথায়। সামনে ছড়ানো পত্র-পত্রিকা থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে বলেছে, আচ্ছা, মা। দ্যাখো তো, এটা কি?

ছবি।

ঠিক। আচ্ছা, কিসের ছবি?

ফ্যাসাদে পড়ে বলেছে, কিয়ের ছবি আমি কেমনে কইয়াম? কতগুলি মানুষ দেখা যাইতেছে, জমিন দেখা যাইতেছে—

হ্যাঁ, আরও আছে, ফসল-রেশমের স্তূপ। আচ্ছা এমন যদি হত এটা আমাদের গ্রাম, আর খেতগুলি যেন আমাদের দাদনচকের! আর মানুষগুলি আমরা, সারা গাঁয়ের বাসিন্দা। এখানে, গ্রাম কারো একার নয় ফসল কারো একার নয়, আমাদের সবার। সবাই মিলে কলে চাষ করি, ভালো সার বীজ ফেলি, আর মওসুম শেষে সোনার মতো ফসল সবাই ভাগ করে নিই। সুখে-দুঃখে সবাই মিলেমিশে বাস করি, তাহলে কেমন হত?

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে শহীদ অপলকনেত্রে চেয়ে দেখলো, মায়ের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রথমটায় কোন কথাই তার মুখে আসেনি, আটকা পড়েছে যেন ঠোঁটের বাঁধুনিতে। পরে অবিশ্বাস্যস্বরে বলে উঠেছে, পাগলের মত এ কি কইতাছস? এও কি সম্ভব!

সম্ভব মা, একশবার সম্ভব! কিছুক্ষণ নীরব থেকে শহীদ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছে, আর

সেদিনকে আনার জন্যেই তো আমরা রাত জাগি!

আঁচলে মুখ লুকিয়ে আনন্দাশ্রু ফেলেছেন হোস্নাবানু। সে অশ্রু বৃষ্টির মতো।

অন্যদিন রাত্রেও এমনি বৃষ্টি এসেছিল। তবে সে বৃষ্টি চোখের নয়, আকাশের। অবিশ্রান্ত ঝম্‌ঝম্ শব্দ-বন্যায় ডুবে গেল উৎকর্ণ মানুষের গার্হস্থ্য আলাপ-কথন, চলমান জীবনের সৃষ্টিশীল পুনরাবৃত্তি। লালচে আলো ছড়ানো টিমটিমে কুপিটা ঝাঁপের কাছ থেকে তুলে এনে মাটির লণ্ঠনে বসিয়ে দেয় হোস্নাবানু, জলের ছাট থেকে সরিয়ে কাঁথাগুলি নেয়। তিন পুরুষ আগেকার করগেট চালের ফুটো দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে পানি পড়ছিল মেঝেয় মুখের চামড়ায় তার কিছু অনুভব করতেই তন্দ্রায়িত দাদিমা খোদার বংশনিপাত শুরু করে দিল।

হঠাৎ বাইরের উঠোনে ছপ্‌ছপ্ শব্দ। দুয়ার একটু ফাঁক করে হোস্নাবানু চেয়ে দেখে বৃষ্টি ল্যাপটানো কালোপোশাকে দুটো মনুষ্যমূর্তি এগিয়ে আসছে বারান্দার দিকে।

রাত অবশ্য বেশি হয়নি। তবু এমন অঝোর মেঘলায় কারা আসতে পারে তা অনুমান করার আগেই বর্ষণের শব্দ-সংগীতের ভেতর থেকে একটা ডাক তীরের মতো ছুটে এল, মা জলদি দোর খোলেন!

দ্যাহ, পাগলামি আর কারে কয়। ত্রস্তহাতে দরজা খুলে বাতিটা চৌকাঠের কাছ থেকে উঁচিয়ে ধরে হোস্নাবানু।

তা আর বলবেন না! হঠাৎ এ-ভাবে বৃষ্টি নামবে কে জানতো! জুতোজোড়াটা বারান্দায় ঝপ্ করে ফেলে দিয়ে শহীদ বলল, দেখলাম ইস্টিশনে বসে থাকলেও চলবে না। ভোর রাতেই আবার মৈমনসিং-এর ট্রেন ধরতে হবে যে!

—তার মানে। আজই আবার—। শহীদের পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই থেকে যায় হঠাৎ।

ও তোমাকে বলিনি। কাঁধে ধরে আলোর সামনে এনে ও বলল, ইনি হচ্ছেন আমাদের সোহানভাই। ওই যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি!

ও হ্যাঁ। মাথায় কাপড় দিয়ে বলল, তা কেমন আছ বাবা। যা পাগলা ছেলে, তোমারে আনছে তো আন্‌ছে অমন মেঘলায়। যাও তোমরা কাপড় ছাইড়া নাও!

দাদিমা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছে। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে শহীদ বলে উঠল, মা, খাবার টাবার আছে কিছু? ইস, যা ভুখ লেগেছে।

তোরা একটু ব। খাওন দিতাছি।

কিন্তু পাতিলে একটি ভাতের দানাও নেই। চালের কলসও খালি। ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে হোস্নাবানু পেছন দুয়ারে বেরিয়ে গেল বাইরে।

ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির এতটুকু বিরাম নেই। মেঘের গুড়্‌গুড়্ আওয়াজ কাঁপিয়ে গেল পৃথিবীর মাটি, নিশ্চুপ ঝুঁকে দাঁড়ানো আমগাছের পাতাগুলিও কাপলো। উঁচু টিলার ওপর থেকে মুক্তাবনের পচা-ডোবায় জোর ধারা যেখানে গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে ভেসে আসছে একটানা ধারার শব্দ। বৃষ্টি আর অন্ধকারের দেয়ালে দেয়ালে ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন ঘর, পাড়া থেকে পাড়া গ্রাম থেকে গ্রাম। তবু বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে আড়াল দেওয়া বাতির টিমটিমে আলো অতল কালোছায়ার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে জনপদের। মিনিট দশেক পর হোস্নাবানু যখন ফিরে আগে, তার কাপড় ভিজে গেছে, কপালের ওপর থেকে মুখ বেয়ে পড়ছে টপ্‌টপ্ ফোঁটা। তার কোঁচে চাল এক পোঁড়া।

একই ঘরে রান্নার জায়গা। মাঝখানে ঝাপ থাকায় ওরা কেউ দেখতে পায়নি। আগুন জ্বেলে ভাত চড়িয়ে দেয় অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায়।

মা, আমার মা! বাসনে বাষ্প ওড়া গরম ভাত দেখে শহীদ আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, দ্যাখো, কত তাড়াতাড়ি ভাত রেঁধে এনেছে।

—যা আর সোহাগ করিস না। দুইডা ভাতই তো খাইবি। আর কিছু খাওয়াইবার কপাল অনেক আগেই ভাঙ্ছে। সোহানের দিকে চেয়ে বলল, শরমাইও না বাবা। পেট ভইরা খাও!

এমন রাত করে আসা, এমন চালচলন কথাবার্তা যে ধরাবাঁধা চলতি পথের লক্ষণ নয়, সে তার কাছে মোটেই অস্পষ্ট থাকেনি, তবু তাকে কিছু বরতে পারে না। মনে হয়, এক বছরে যে বড্ড বেশি বেড়ে গেছে, তার স্নেহের লতাকুঞ্জ ছাড়িয়ে। ছেলের ব্যক্তিত্বের শাখাপ্রশাখায় তার সকল স্নেহ, সকল অনুরাগ কেবল শ্বাস ফেলে স্পর্শ করে যায়, একেবারে কাণ্ড পর্যন্ত জোর নাড়া দিতে পারে না।

তাই রাত তিনটেয় ডেকে শহীদ যখন বিদায় চাইল, বাধা দিতে পারল না। মৃদু তিরস্কারের সুরে কেবল বলল, তোর কি অইছে বুঝি না। মাথায় বিষ্টি নিয়া আইলি, রাতের আইন্ধারে চললি আবার!

রাতের বেলায় না চললে সকালকে পাওয়া যায় না। ব্যাগের ফিতেটা কাঁধে ঝুলিয়ে ও জওয়াব দিল।

কী কইলি?

না, কিছু না। ও বলল, আমরা তো এখানে মাত্র দুজন। আর ওদিকে অনেকে আমাদের অপেক্ষা করছে। এখন কোন্‌টা বড় বল? দুজনের কষ্ট, না অনেকজনের ভালোবাসা?

এ কথার কোন জওয়াব ছিল না। কেরাসিন কুপিটা উঁচিয়ে ধরে গ্রীক ভাস্কর্যের মতো দাঁড়িয়ে দরজায়, ওর কথাগুলি তার কানে বাজতে লাগলো বারবার। টিপটিপ বৃষ্টি তখনো থামেনি। পাতলা মেঘের আড়ালে শুকতারা হয়তো নেমে আসছে পূব আকাশের স্বর্ণ-সীমানায়। উঠোন পেরিয়ে আমবনের নিবিড়তায় মিলিয়ে গেল দুটো ছায়ামূর্তি।

এসব স্মৃতি দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। মনে অপরিসীম স্থৈর্যের এক প্রস্তরলিপি, যেখানে একটু আঁচড়াও লাগতে পারে না শাশুড়ীর কান্নায়। লোকের সমালোচনায়।

সূর্য এতক্ষণে মাথার ওপর উঠেছে, তবু দাদিমার গুনগুনানির এতটুকু ছেদ নেই। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে দাঁতহারা মুখে মিঠে আলু চিবোয়, নড়াচড়ায় শুকনো কাঁঠাল পাতা মচ্‌মচ্‌ করে ওঠে একেকবার।

শেষ আলুটায় খোসা ছাড়িয়ে ভাঙাগলায় ডেকে উঠলো, বৌ কই লা। ও বৌ! আলো পোড়ারমুখী কোন্ সায়রে গিয়া ডুব দিলি!

মুক্তাবনের ধারে মাটি কুপিয়ে শশার বীজ পুঁতছিল। ডাক আসে তার কানে গেল। চলে আসে কোদালটা সেখানে রেখেই। বলল, কী অইছে!

অইব কি। নে আলু খা।

কয়দিন ধরে মিঠে আলুটাই প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই সের ধান টাকায়। দুই টাকার ধানে এক সপ্তাহ চালাতে হয় বলে ভাতের ব্যবস্থা কেবল রাতের বেলায়। গ্রামের শতকরা আশিজনেরই এই হাল, একান্ত খোলাখুলি। পাড়াপড়শির সামনেও আলু খেতে কারো লজ্জা নেই, নেই সংকোচও।

কই গো বুড়ি। বাড়ি আছ নি! উঠোন পেরিয়ে সামুনে আসতে মালুম প্রধান ডাকাডাকি শুরু করে দিল। মাথায় কাপড় টেনে একপাশে সরে দাঁড়ায় হোস্নাবানু। একটা আলু বিনা চিবোনিতে গিলে ফেলে দাদিমা তেড়ে উঠল, তুমি আবার আইছো? তোমারে না মানা করছি

এ বাড়িতে আইতে। তোমার চোখের চামড়া নাই?

প্রধান দমে না, বরং খ্যাক্‌খ্যাক্‌ করে হেসে উঠল। চৌকাঠের ধারে জলচৌকিতে বসে বলল আবার, আহা অত রাগ কর কেরে! বিনা কামে তো আম আই না। একটা খবর দিতে আইছি।

খবর আবার কিয়ের?

হু-হু-হু! প্রধান টেনে টেনে বলতে লাগল, হেই তো কতা। খবর আবার কিয়ের। তোমরা আমারে যাই ঠাওরাও আমি না ভাইবা পারি না।

আসল কতাডা কও।

কী ভেবে নিয়ে মালুম প্রধান বলল, তা অইলে কই। আমার মালুম অয়, শহীদ বাঁইচা আছে কিনা ঠিক নাই। জেলখানায়—

কি! কি!

আহা, অত উতালা অইও না। আমি বানাইয়া কইতাছি না একটুও। খবরের কাগজেই বার অইছে। আমি কি আর জানতাম! আরঙে বিধান মাস্টার আমারে কাগজ দিল। খবরডা পড়তাছি। বগল থেকে ভাজকরা সংবাদপত্রটা বের করে সামনে ধরল, অল্প বিদ্যায় শব্দে শব্দে হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগল, জেলে রাজবন্দী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ। অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য পুলিশ গুলিচালনা করিতে বাধ্য হয়।

ভাষার কারিকুরি না বুঝলেও পরিচিত শব্দগুলো একেকটা ঢিলের মতো মনের মধ্যে আঘাত করলো। সব কান্না, গুন্‌গুন্‌ থমকে গেল। একটা কথাও বেরুলো না মুখ থেকে, আলু-চিবানো গাল নড়লো না, বাসন থেকে উঠলো না হাত, মচমচে কাঁঠাল পাতা একটু শব্দও করলো না আর, ছানি-পড়া চোখ খোলাই রইলো—দাদিমা স্তব্ধ হয়ে গেল। ঝাপের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হোস্নাবানু, এক সময় মাথায় হাত দিয়ে কখন বসে পড়েছে তার সে খেয়াল ছিল না। তার চোখের সামনে কাঁপতে লাগল খবরের কাগজটা, হরফগুলো কীট হয়ে যেন ছুটোছুটি করতে লাগল ; কাঁপতে লাগলো প্রধান ঘরবাড়ি উঠোন, রোদের ফালি, আমবন, দাদনচকের পথ।

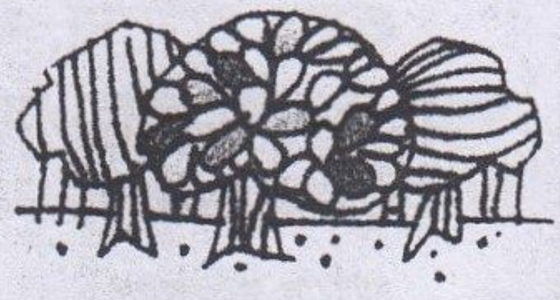
তারপর দাদিমার ঠোঁটদুটো নড়লো, চোখের পাতা কাঁপলো, হৃদয়বিদীর্ণ আর্তস্বরে অকস্মাৎ চিৎকারে করে উঠল, ও মাগো! বাতি নিইবা গেল গো। হয়তানরা আমার বাতি নিবাইয়া দিল গো!

লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শাশুরীর চিৎকারে হোস্নাবানু মুখ তোলে একটা শতাব্দী সা করে চলে গেছে কানের পাশ দিয়ে। ভেতরে সঞ্চিত এক তীব্র অনুভূতির শিহরণে মুখের অণুপরমাণুগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল! আকুলকণ্ঠে দ্রুত বলল না, না, এ আমি বিশ্বাস করি না, করি না! তাদের নিবাইতে পারে এমন শক্তি কারুর নাই। আমি জানি তারার পিছনে অনেক মানুষ, অনেক মানুষ!

বড়ো বড় দুফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল তার চোখের স্থির তারা থেকে। মুখ ফাঁক করে বেকুপের মতো চেয়ে রইল মালুম প্রধান। হয়তো বুঝতে পারেনি, এ অশ্রু আনন্দের কি বেদনার।

এপ্রিল, ১৯৫০

ধানকন্যা



আজ শরতের প্রথম রাত। তারার ঝালর দেওয়া ঝলমলে আকাশের চোখে স্বপ্ন, শিশির-ঝরানো স্বচ্ছ চাউনি। আর তারই আভা ধানক্ষেতভরা সারা প্রান্তরে আবছায়া মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে। মফস্বল ইস্টিশন থেকে একটা পথ মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেছে, আঁকাবাঁকা। এখানে সেখানে মাটির ঢেলা, অঢেল। চারপাঁচ মাইলজোড়া হাউরের বুকে, দিনের বেলায় পথটাকে দেখায়, ঠিক খোলস ছাড়ানো সাপের মতো, শিকারের সন্ধানে যে চলেছে একা।

এখন চারদিকে প্রকৃতির আদিম উদাসীন নির্জনতা।

তবু এখানেও মুখরতা নামে। চৈত্রের মাঝামাঝি কিংবা বৈশাখের প্রথমে যে ফসল বোনা হয়, অঘ্রান এলেই তা স্বর্ণশস্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। দূর তল্লাট থেকে গাঁটরী-বোচকা ও কাস্তে সম্বল করে দলে দলে লোক আসে—ঘামেভেজা, রোদেপোড়া, তামাটে চেহারা। ছাউনি ফেলে, খড়ের। ধানকাটার ঘস্‌ঘস্ আওয়াজে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যেন সমস্ত মাঠের বাতাস।

মৌসুমের সময় ছাড়া এ রাস্তার পথিক খুব কম।

একে তো অনেকদূরে জনবসতি, তা ছাড়াও এমনসব কিসসাকাহিনী এ জায়গার সঙ্গে জড়িত, অতি বড় বুকের পাটা যার সেও সাহস করেনা রাতের বেলায় এখানকার মাটি মাড়াতে।

অথচ শেখ ফরিদ এগিয়ে চলছিল একেবারে একা। গায়ে তেল চিটচিটে খাকি সার্টটা রয়েছে, পা'য়ে সদ্য-খোলা জেল-কড়ার টান আলতোভাবে গুঁজে নিয়েছে কোমরে আধছেঁড়া লুঙির খুট।

দিনের বেলা হলে হয়ত সে দেখতে পেত, তার অতিপ্রিয় রূপখালি নদীর ওপর গাঙচিল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে, নিখুঁত আশমানি রঙের পটে ফকফকে সাদা-ডানার উঠতি পড়তি-মাঠের প্রান্তে হাঁসুলির মতো বাঁকটাকে ঘিরে। কেমন প্রাণচাঞ্চল্য। সারাগাঙ জুড়েই অজস্র বাঁশের খুঁটি, কিছু পরপর কচুরিপানা ও কলমীলতার গোলাকার বৃত্ত। ছোট ছোট ডিঙির তৎপরতা, গভীর মনোযোগের সহিত বসে বসে কিসান-ছেলেদের মাছ-ধরা। হয়ত সে লক্ষ্য করত, পাকা-ধানের সোনালি ছড়া পরস্পর জড়িয়ে পড়েছে মাটিতে ; সব ক্ষেতে সম্পূর্ণ পাক ধরেনি, কেবল হলুদ হতে শুরু করেছে, তাঁতের কাপড়ে চমকপ্রদ কারুকাজ আর কি! তার চোখদুটো মাঠটিকে ওজন করে চলত।

অতীতের দিনগুলি বায়োস্কোপের ছবির মতো ভেসে উঠত। আজকের সঙ্গে তার মিলের চাইতে গরমিল বেশি হলেও, এ-দু'য়ের নিগূঢ় আত্মীয়তা মনোযোগ এড়িয়ে যেতনা। এই মাঠ, এই ধান। ওই নদী। সূর্যের স্নেহে সবকিছুই কিশোরীর সলজ্জ হাসির মতো রাঙা, পদ্মবনের ভেতর থেকে সে হাঁসজোড়া পাখা ছড়িয়ে বেরিয়ে আসে, মৌসুমের প্রাচুর্য তা'দেরও ডানায়, নলখাগড়ার ডগাগুলিতে আনন্দভরা ক্লান্তি।

কিন্তু এখন সে কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা।

তার সামনে কেবল বৈষ্ণব পালার রজনী। আর আধা-পরিচিত একপথ।

রূপকথা কাহিনীর শাপগ্রস্ত আত্মার নিঃশব্দ বিচরণের মতো সে একটানা পা টেনে টেনে চলেছে। সারা মস্তিষ্কে এলোমেলো ভাবনার ঝড়। আজ সে চলেছে এ-পথে কতদিন পর!

মনে মনে হিসেব করে দেখে, পুরো তিন বছর। পুরো তিনটি বছর পরে এখানকার বাতাসে সে নিঃশ্বাস ফেলছে।

তিন বছর আগেকার একটি দিন। সবেমাত্র সকাল হয়েছে। উঠোনের একপাশে থোকা

থোকা ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দুগুলি তখনো ঝরে যায়নি; মৃদুমন্দ হাওয়ায় একেকবার নড়ে উঠছে, কুমড়ো পাতার ফাঁক দিয়ে ঝলকে-পড়া সূর্য-কিরণে। একটু গরিমসী করেই ঘুম থেকে উঠেছে শেখ ফরিদ। সামান্য একপ্রস্থ জমি। আগাছাও জন্মেনি এবার বন্য উত্তেজনায়। একবার নিড়ানি হয়ে গেছে। আরেকবার কাস্তে বুলিয়ে ঘনচারা বেছে দিলেই বেশ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত।

টিপে টিপে ডালা কলকেটায় এক ছিলিম তামাক ভরে মন লাগিয়ে টানে সে। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কাজলীটার দিকে। কাঁচা ঘাস পেয়ে তার গতরটা তেলতেলে হয়ে উঠেছে। দুধও কিছু বেশি দিচ্ছে। আগে দিত সের আড়ায়েক আর এখন সাড়ে তিনসেরের কাছাকাছি। বাজার খরচটা কাজলীর দুধ বেচে ভালভাবেই চলে যায়। মরবার কয়েক মাস আগে একটা মাদী বাছুর কিনে দিয়েছিল তার বাপ ; তাকেই মাঠে মাঠে চড়িয়ে, ঘাস-পানি খাইয়ে আদরের কাজলী করে তুলেছে। তার কাছ থেকে পয়সা অবশ্য সে পায়, কিন্তু তা-ই ভালবাসার একমাত্র উৎস নয় ; প্রচুর রৌদ্র হাওয়ায় প্রথম যৌবনের মান অভিমান যত্নের ভেতর দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেখানে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই।

ছোট মুচিতে কিছু সরষের তেল আর টাকটা হাত নিয়ে উঠোনে নেমে গেল দুধ দুইতে। আরঙ থেকে ফিরেই একবার মাঠটা ঘুরে আসবে।

ঢুব্! ঢুব্! ঢুব্! ঢুব্!

ভারী শব্দের ঝাপটায় সব এলোমেলো হয়ে যায়। অবাক্ হয় সে। সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও ধড়াস করে ওঠে। এ ধরণের শব্দ যেন তার পরিচিত। ছোটবেলা কোথায় শুনেছে অনেকবার, ঠিক মনে পড়ছেনা। ঢোল হলেও, এ বিশেষ ধরণের ঢোল। টাকটা মাটিতে রেখে পা মেলবার আগেই একটা সদম্ভ কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ঃ

নীলাম! নীলাম! খাতক মৃত শেখ জমির, তস্যপুত্র শেখ ফরিদ—তিন বছরের খাজনা অনাদায়ে তার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম!

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেনা শেখ ফরিদ। ঢোল ডগর পাইক—পেঁয়াদা নিয়ে নীলামের রীতি অনেকদিন অচল হয়ে গেছে। তা'ছাড়া কোনবার সে তো পারতপক্ষে খাজানা বাকি রাখেনি। গত দু'বছর ভাল ফসল হয়নি আর বাইরে কাজও পাওয়া যায়নি বলে বকেয়ার খাতায় নাম উঠেছে, একথা সবসময়ই তার মনে আছে। সুযোগ হলে বিনা জানানিতেই চুকিয়ে দিয়ে আস্‌বে তা দেওয়ান সাবকে অনেক করে বলেও এসেছিল একদিন। অথচ একি কাণ্ড! নীলাম করার আগে তাকে শেষবারের মতো জানানোও তো উচিত ছিল। এ ব্যক্তিগত রোষ ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু তার বাপ শেখ জমির দেওয়ান সাবের গালচাপ্পায় একটা থাপড় মেরেছিল সেতো একযুগ আগের কথা। তার প্রতিশোধ কি এতদিনে নিতে চলেছে?

গামছাটা কোমরে পেঁচিয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কানে কলম গুঁজে খাতাহাতে দাঁড়িয়েছিল তহশীলদার। তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, কেমন বুঝলে মিয়া? এদ্দিন কইলাম ভালয় ভালয় দেনাডা চুহাইয়া দেও, গায়-গতরে লাগলনা! এইবার খোদ মালিকের হুকুম, অহন তেরিবেরি করবা কোন্‌হান দা?

খামকা মিছা কতা কইতাছেন আপনে! সহজ গলায় বলল শেখ ফরিদ, আপনে কোনদিন কন নাই যে বহেয়া না দিলে কোরক্ আইব। কইলে, খাই না খাই মাজনের দেনা দিয়া দিতাম!

তহশীলদার বলল, অহনে এতা কইয়া লাভ নাই। তিন বচ্ছর খাজ্‌না দেও নাই, তাই সই।

তাই সই! কইলেই অইল আর কি! ঠোঁটদুটো উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল শেখ ফরিদের।

তহশীলদার ঘাগু লোক। পনেরো বছর ধরে এ-কাজই করে এসেছে, কাজেই বাজে কথায় সময় নষ্ট করার ধৈর্য তার নেই। আঙুল কাটা গেলে একটু ছট্‌ফট্‌ তো করবেই, সেদিকে নজর দিলে চলেনা। হাত নেড়ে বলল, অত জানিনা বাপু। মালিহের নুন খাই, যা হুকুম পাইছি তাই করুম।

তার ইংগিতে ষণ্ডা-মার্কা কয়েকটি লেঠেল ঢুকে গেল ভেতর বাড়িতে।

বুড়ি মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বারান্দায়।

আমার বাছার কি অইব গো। আমি কই যাইয়াম গো। ও মাগো।

শেখ ফরিদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলনা, মাথার চুলগুলি নিমেষে সজারুর কাঁটা হয়ে উঠেছে। কানের দু পাশ দিয়ে গরম ছুটেছে। একটা দুর্নিবার ঘৃণার দমকা-হাওয়া ছুটে এসে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে মনপ্রাণ। অস্ফুট যাতনায় চেঁচিয়ে উঠে সে ঘরের দিকে ছুটল, চোখজোড়া অঙ্গারের মতো জ্বলছে।

ততক্ষণে লেঠেলরা বড়ো চৌকিটা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এসেছে। কাফিলা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা গাইয়ের দড়িটা খুলছে একজন।

সাবধান! ফরিদ আবার চেঁচিয়ে ওঠে, কাজলীর গায় হাত দিবানা। বেশি ভালা অইবনা কইছি!

এরপর কী হয়েছিল আজ পুরোপুরি মনে নেই। চোখ থেকে অন্ধকার যখন নেমে গেল, সে দেখতে পেয়েছিল, মাটিতে পড়ে তহশীলদার হাত-পা খিঁচছে। মাথা থেকে রক্ত উঠছে ফিনকি দিয়ে।

দেওয়ান বাড়ির কর্মচারীর এই রক্ত তার জেলে যাবার পথ চিহ্নিত করে দিল।

মাঠের মাঝখানে শেওড়া গাছটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে। দ্রুত হাঁটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। আরও মাইল খানেক হাঁটতে হবে! একটু দাঁড়িয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে আকাশে চেয়ে, আবার সামনে বহুদূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে সে অনুভব করল, নীরবতারও একটা ধ্বনি আছে—ভাষাহীন সুগভীর ধ্বনি, যা ভাবনাকে টেনে নিয়ে যায় টুকরো স্মৃতির বন্দরে বন্দরে। সেখান থেকে কিছুই হয়তো পাবার নেই, তবু মৃদু হাওয়ায় মনের শুকনো পাতাগুলি নড়ে। দোল্‌ খায়।

জেলের জীবন, ছোঃ, এও আবার একটা জীবন। উঁচু পাঁচিলের আড়ালে সে আরেক দুনিয়া, যেখানে জীব আছে মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু মানুষ নেই। বাইরের চালচলন সব সেখানে অচল। বলে কিনা ফালতু? ফালতু কা'রা? দু'জন দাগী তার সঙ্গেই কাজ করেছে, তাদের কাছ থেকে শুনেছে, বিনা কারণে তারা চুরি করত না ; দিদার তিনবার মাত্র চুরি করেছে, আর প্রত্যেকবারই ছিল তার ঘরে চাল বাড়ন্ত। ছেলেপুলে না খেয়ে মরছে, এ কোন্‌ বাপ সহ্য করতে পারে? তবু যদি কামকাজ পাওয়া যেত জান খাটিয়ে দিন চালানো কঠিন হতনা। গদাই যে ফেলু বেপারীর আঙুল কেটে দিয়েছিল তা কি মিছামিছি? সে ছিল হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, ধানচাল গুদাম ভরতি রেখেও বাজার গরম না হলে একটা দানাও ছাড়তনা। গদাই তো কেবল আঙুলগুলি কেটে দিয়েছে, তার কল্লাটা ফতে করা উচিত ছিল। এদিকে মানুষ মরে, ওদিকে শাদ্দাদের বেহেশ্‌তখানা।

অনেকদিন অবাক হয়েছে শেখ ফরিদ। চোর-ডাকাত-দাগীরা বাইরে এত দুঃসাহসী কাজ করেও এখানে সব যেন খাঁচায়-বন্ধ বুনো জানোয়ার বনে যায়। বেড়ি পায়ে টু শব্দটি নেই।

কাহিল হয়ে কাজে একটু ঢিল দেয়ায় জমাদার শাব্বীর খান তার কাঁধে ডাণ্ডা মেরেছিল একদিন। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল, ডাণ্ডাটা হেঁচকা টানে কেড়ে নিয়ে এক বাড়িতে মাথাটা ভেঙে দিলে কেমন হয়! হাত বাড়িয়ে দিয়েও ফিরিয়ে নিয়েছিল কেবল একটি কথা মনে পড়ায় ঃ

তুমি ফিইরা আও। আর কোন গোলমাল কইরোনা! তোমার পথ চাইয়া থাকুম আমি, তোমারই পথ চাইয়া থাকুম্!

এই একটি কথা পীরের দেওয়া বশীকরণ তাবিজের মতো। প্রতিদিন সকালে ঘণ্টা বেজেছে, ধুড়মুড় করে উঠে গিয়েছে সাথীদের সঙ্গে, সময়ের একতিল করেনি এদিক ওদিক। কি জানি যদি কোন খুঁৎ ধরা পড়ে, শাস্তির দিন বেড়ে যায়। পাপীদের সুপথে আনার জন্যে তৈরি ছোট মসজিদটায় গিয়ে নামাজ পড়েছে, মোনাজাত করতে গিয়ে চোখের পানিতে বুক ভেসে গেছে। ছাড়া পেয়ে গিয়ে যেন ফিরে পায়। ওকে জীবনে আবার।

গ্রামের পথে এসে আরো জোরে পা চালাতে থাকে শেখ ফরিদ। সুপোরি গাছগুলি পথের পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে। পরস্পর হাত ধরে পাহারা দিচ্ছে যেন, ও ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেবেনা ভেতরে। অন্ধকারে কলার পাতা দুলছে, তাকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে হয়ত। পচাগর্তের ধারে বিদঘুটে পোকাগুলি ঝিম্ ধরে ডাকে, একটা পেঁচা উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে। তার বুকটা ঢিব্‌ঢিব্ করতে থাকে। কপাল থেকে গাল বেয়ে টপ্‌টপ্ করে ঝরে লোনা ঘাম, খাকি সার্টের নিচে গেঞ্জিটা লেপটে যায়। চোখকান বুঁজে সে এগুতে থাকে পথে কোন লোক দেখলে মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে যায় নি।

হাত-পা সাপটে ধরে কে যেন তাকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে।

একটা বাড়ির সামনে এসে মেহেদীগাছের ডালে ধরে শেখ ফরিদ দাঁড়িয়ে পড়ে চুপচাপ। হ্যাঁ, এইতো সেই স্থান, চোখের তারাদুটো স্থির হয়ে থাকে। দশ-পনেরো হাত দূরে সেকেলে ধরণের একটা ছনের ঘর অন্ধকারে ঝিম্ ধরে রয়েছে, বেড়ার কাছে মাটির পৈঠায় টিনের কুপি জ্বলছে। অবিরাম উসকাচ্ছে কালো ধোঁয়া। সেদিকে চেয়ে কিছুই ভাবতে পারেনা সে ; কেবল একটা অজানিত উৎকণ্ঠায় বুকটা ঢিব্‌ঢিব্ করতে থাকে। প্রতিমুহূর্তেই সে আশা করছিল, মাথার চুল আলুথালু একটা পরিচিত মনুষ্য মূর্তি চলাফেরা করবে ঘরের মেঝে দিয়ে, মাঝে মাঝে আলোটাকে আড়াল করে দাঁড়াবে ; বুড়ো বাপের জন্যে কলকে সাজাতে বসবে, টিকের লাল আগুনে তার ঠোঁটের ভাজ স্পষ্ট দেখা যাবে ; আর খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেলে মাথায় কাপড় টেনে মাদুর পেতে বসবে, বাপটা কেবল মেয়েকে শোনাবার জন্যেই সয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামালের ছেঁড়া পুঁথিখানা পড়তে থাকবে ভাঙা গরগরে গলায়।

দু'মনা হয়ে একপা এগিয়ে গিয়েও দাঁড়ায় আবার, মানুষ তো দূরের কথা, একটা বাঁশপাতাও কোনখানে নড়ছেনা।

তবু ঘরে মানুষ নিশ্চয় আছে। তা নইলে আলো জ্বালবে কে, এটা তো পীরের দরগাহ নয়?

বারান্দা থেকে উঁকিঝুকি দিয়েও কিছু ঠাহর করতে না পেরে অবশেষে সে ঘরে ঢুকল।

বাঁশের চাটাইয়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে শেখ আন্দু। দুতিনটে ছেঁড়া-কাঁথা গায়ে জড়ানো। একটু পর গড়্‌গড়্ করে কেশে ওঠে, বুকের ভেতরটা আতংককর শীতল শব্দে বাজতে থাকে।

শেখ ফরিদ তার কাঁধের ওপর হাত রেখে ডাক দেবার আগেই মাথা তুলে ঝাপসা বন্য দৃষ্টিতে তাকাল। ভাঁজ-পড়া কালছিটে মুখে কোন ভাবের অভিব্যক্তি নেই। গোর দেয়ার পর কাফন ছিঁড়ে ফেলে কবর থেকে যেন এইমাত্র উঠে এসেছে না-বলা কথাগুলি জানাবার জন্যে।

তুই খালি রক্ত বার করছিলে, খুন করতে পারস নাই। অতিকষ্টে কাশি দমিয়ে রেখে বুড়ো গোঙাতে থাকে, একটা মানুষেরে খুন করন কি খুবই শক্ত?

কথার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারেনা শেখ ফরিদ। কি বলবে তা'কে তাও যেন ঠিক করতে পারেনা; মগজের ভেতর সবকিছু ওলটপালট হয়ে গুম্‌গুম্ করছে।

বুড়িটা রান্নাঘর থেকে একপাতিল গনগনে আগুন তুলে এনে তাদের পাশে রাখে। সামনে একটা নতুন লোককে দেখতে পেয়ে কপালের ভাঁজগুলি আরো একটু কুঁচকে যায় মাত্র, কিছু বলার চেষ্টাও করেনা। কুপির লালচে আলোয় ঘরের ভেতরের সমস্ত আবহাওয়াকে পুরোপুরি ভৌতিক মনে হয় শেখ ফরিদের কাছে। তার সকল জিজ্ঞাসা বুকের কড়ায় টিব্‌টিব্‌ করছে।

এভাবে আরো কতক্ষণ কেটে যায় কারুর খেয়াল থাকেনা। কোন্ প্রশ্ন করার চেষ্টাও করতে পারে না শেখ ফরিদ, সকল কথা যেন তার ফুরিয়ে গেছে। বুড়িটা দম-দেওয়া পুরনো কাঠের পুতুলের মতো দুটো সানকি ভরে ভাত রেখে যায়, তরকারিসমেত। সাধেনা, টু শব্দটুকুও করেনা। বুড়ো একটা বাসন টেনে নিয়ে ভাতের দলা পাকাতে পাকাতে কথা কয়ে ওঠে, আমি কি জানতাম? না, আমি কিছুই জানতাম না! হেদিন পানি আছিল না ঘড়ায়, বুড়িরও বুড়িরও শরীল খারাপ। আমি কইলাম কনকরে ঘাড়ে যাইতে! আমি জানতাম না!

একটি গ্রাস মুখে দিয়ে বুড়ো চিবোতে থাকে অসন্তুষ্টভাবে, যেন কথা না বলে ব্যাপারটা শেষ করতে পারলে বাঁচে।

আমার উকুম্, হেই গেল। তার লগে আরো কয়েকজন গেল। কলসিতে পানি ভরছে, অমন সময়।

দেখা গেল, ছই-দেওয়া একটি ডিঙি নৌকো এগিয়ে আসছে পানিতে মৃদু ঢেউ জাগিয়ে। সামনের পাটাতনের ওপর বন্দুকহাতে দাঁড়ানো একটি লোক। বয়েস বেশী নয়। সাতাশ-আটাশ হবে ; তার চেহারায় ও চোখেমুখে আভিজাত্য ও লাম্পট্য একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে। ইনিই হচ্ছেন দেওয়ান-বাড়ির ছোট সাব। শহরে থাকেন, কি ব্যবসা করেন গ্রামের কেউ না জানলেও কাড়ি কাড়ি টাকা যে করেছেন তাতে কারো সন্দেহ নেই। হপ্তাহখানেক আগে বাড়ি এসেছেন। পাহাড়ী হাঁসের দংগল এসে নেমেছে গাঙে, শিকার করতে বেরিয়েছেন।

ঘাটের অদূরে কচুরীপানার ধারে ছোট একটি ঝাঁক পড়েছে, বন্দুকের নালটা সেদিকে তুলে ধরতেই ছোটসাবের দৃষ্টি হঠাৎ আটকে গেল।

মেয়েটা তো খাসা হে! তহশীলদারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, একদম তাজা মাল!

লজ্জায় জিভ কাটে তহশীলদার। বেফাঁস কথা তার ভালো লাগেনা এমন নয়, তবু বয়েসের একটা মর্যাদা তো রয়েছে।

সত্যি খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল কনকতারাকে ; হলদে জমিতে কালোপাহাড়ের দিশি শাড়িটা তাকে যেন উড়িয়ে নেবার চেষ্টায় মেতেছে। একটু নুয়ে কলসীতে পানি ভরতে দেহের যে ছন্দ, তাতে প্রথম যৌবনের পরিপূর্ণতা ওপচানো, গলায় রুপোর হাঁসুলি মায়া-রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছে। স্বাভাবিক কৌতূহলে সে নৌকোটার দিকে চাইল মাত্র একটিবার, লোকটার লালচে চোখের লোলুপ চাউনিতে বিব্রত বোধ করল। চেয়ে না চেয়ে জলদি কলসীটা ভরে সাথীদের রেখেই সে ছুটল বাড়ির দিকে।

বন্দুকটায় ছট্‌ছট্‌ করে দুতিনবার কায়দা দেখিয়ে রেখে দিলেন ছোটসাব। একটা শিষ দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করলেন।

হাত ধোয়ার পর সানকিটা সামনে ঠেলে দিয়ে শেখ আন্দু বলল, আমি বুঝতাম পারি নাই। বাড়ি আওনের পর কন্‌করে কয়েকটা ফরমাস দিলাম, করতে গিয়াও করলনা। বুঝলাম তার মন ঠিক নাই। সন্‌ধার দিগে তামুক টানতে টানতে আমি ভাবতাছিলাম—

গলাখাকানি দিয়ে তহশীলদার উঠোনে ঢুকল। বেশ হাসি খুশি ভাব। সরু বেতের ছড়িটা ঘুরিয়ে বারান্দায় এসে উঠল কাউকে না ডেকেই, কপাটের কাছে জলচৌকিটা টেনে নিয়ে বসল।

তারপর শেখের পুত, আছ কিমুন! কই গো বুড়ি, তোমরার রাজকন্যাডা কই, হুঁকাটুকা দিতে কও!

বুড়ো-বুড়ি অবাক না হয়ে পারেনা। এমন লোক যে তাদের গরিবালয়ে পায়ের ধুলা দেবে তা ছিল খোয়াবের অতীত; অথচ কেবল আসাই নয়, কুটুম্বের মতো খোশমেজাজে ব্যবহার। কলকেটা ভালো করে সেজে বাড়িয়ে দেয় শেখ আন্দু, তার ঝাপসা চোখের আবছায়ায় কেমন যেন একটা সন্দেহ বারেবারে ঝলকে ওঠে। জমিজমা ও খাজনা তোলার ব্যাপারে তহশীলদারের রূপ এতদঞ্চলের কারো অজানা নেই, পান থেকে চুণটুকু খসতে দেয়না এমনি চামার।

হুঁকোয় টান দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলে ওঠে, বরাত ভালা, শেখের পুত তোমরার বরাত ভালা!

হঠাৎ বরাতটা কিভাবে ভালো হয়ে গেল তারা কেউ বুঝতে পারেনা। ঝাঁপের আড়াল থেকে সবকথা শোনে কনকতারা। আজ দুপুরবেলার ঘটনার সঙ্গে কোথায় এর যোগসূত্র রয়েছে। তার বুকটা দুরুদুরু করে বাজতে থাকে, ফুসফুসে রক্ত-সঞ্চারণ দ্রুত হয়ে ওঠে। বয়েস তো আঠারো। তার ওপর পোড়া চেহারাটা দিনদিন যেন গোলাপফুল ফোটাচ্ছে চারপাশে, একটা অজানিত শিহরণের জ্যোতির্লোক। তাই তো এমন তীব্রভাবে বিঁধেছিল বন্দুক হাতে দাঁড়ানো সেই লোকটার লুব্ধ চাউনি।

হরিণীর মতো কান খাড়া করে শুনল সে তহশীলদারের কথা। কথা প্রথম উঁচু পর্দায় ছিল, ক্রমে নেমে এল। শেষ পর্যন্ত ফিসফিসানি। রাত অনেক হয়ে গেল তবু যেন তার আদিঅন্ত নেই। একা এলেও, সে যেন মোটেই একা নয়। তার পুরু ঠোঁট ও কটাচোখের আড়ালে লাঠি ও সড়কি হাতে দাঁড়ানো যেন শত শত পেয়াদা-পুলিশ! কথাবার্তা শেষ করে যখন উঠল তখন রাত বারোটা উৎরে গেছে।

শেখ আন্দু অপরাধীর মতো বলল, আমার একদম খায়েশ আছিল্ না, তুমি বিশ্বাস কর। গাঁয়ের মাতবর শয়তানগুলিন্‌রে হাত কইরা ধইরা নিয়া গেল্ আমার কনক্‌রে। হ্যাঁ ধইরাই নিয়া গেল! আমার কোন—

—থাক্, থাক্। খুব অইছে। শেখ ফরিদ চেঁচিয়ে ওঠে নিজের অজ্ঞাতসারেই, কিসের যেন এক তীব্র জ্বালায় ; এ পর্যন্ত ভাতের একটি দানা ও সে মুখে দেয়নি।—সব চিন্‌ছি সব! সব!

দু'হাতে মুখ ঢেকে গোঙানির মতো শব্দ করতে করতে বেরিয়ে যায় সে। চোখে জ্যোতি নেই, তবু শেষ আন্দু বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, অনেকদূর।

আকাশে তেমনি ঝলমল তারার হাসি। তার নিচে সারা প্রান্তর নীরব হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস তুলছে। দেওয়ান-বাড়ির জরাজীর্ণ পাঁচীলগুলি রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা, কেবল কোন কোন ঘরের ভাঙা জানালার ম্লান আলো লোকবসতির পরিচয় বহন করছে। দক্ষিণ দিকের কামরাটায় জরাগ্রস্ত দেওয়ান-গিন্নি পিকদানিতে মুখভরা থুথু ফেলে বক্‌বক্ করে চলেছেন অবিরত ; ছোটলোকের হাভাতে মেয়ে ঘরে এসেছে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে তবে যাবে। এসব দেখার চাইতে গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ছিল ভালো।

বড় আয়নাটায় ছায়া পড়তেই থমকে দাঁড়ায় কনকতারা। তার দেহের চিরাচরিত কাঠামো যেন আর নেই, চোখমুখের আড়াল থেকে কেন যেন উঁকি দিয়ে উঠছে বারবার। চিরুনিটা ফেলে রেখে সে উঠে যায় দেয়ালের এক কোণায় ; চূণকামের ওপর কাঠকয়লার সারি সারি অসংখ্য দাগ কাটা রয়েছে। বিড়বিড় করে কি উচ্চারণ করে ঠোঁটে, তারপর তার

চেহারা নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

তিন বচ্ছর!

জানালাগুলি বন্ধ করে দেয় সতর্কহাতে। হারিকেনের চিমনির ওপরে একটা খাতা ঠেকিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ছোট-সাব ঘুমিয়েছেন।

বাইরে ইট-খসে-পড়া দেয়ালের পাশে জামরুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। তার আলগা চুলের গোছা নড়ে বাতাসে।

সে এক অবাক কাণ্ড। কেন এসে দাঁড়িয়ে সে নিজেই তার মাথামুণ্ডু কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না; অন্তরের একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশের ছায়াঘন বনের আড়ালে কোন এক ব্যর্থবাসনার শেষ রক্তবিন্দুটুকু যেন দানা বেঁধে আছে ; বারে বারে ঝলকে ওঠে, নাড়া দিয়ে যায় মনপ্রাণ। কিন্তু আজকের মতো এমন তো আর কোনদিন হয়নি? এমন চাঞ্চল্য। সারা চেতনার ওপর দিয়ে যেন কী এক ঝড় বয়ে চলেছে।

কে! সে চমকে ওঠে আচমকা!

না, একটা বাদুড় উড়ে গেল জামরুল গাছের ডাল থেকে। বুকটা তার ধড়ফড় করতে থাকে অজানা আশংকায়। মুখ ফিরিয়ে সে ঘরের দিকে পা বাড়াতে চাইল।

দাঁড়াও!

কেডা? সে চমকে ওঠে আবার।

এবার আর মনের ভুল নয়। সত্যি একটা লোক দেয়াল টপকে তার সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে—কেডা? কেডা তুমি?

চুপ! চেঁচাইও না! অন্ধকারে যমের মতো লোকটা তার আরো কাছে এসে দাঁড়াল। অস্পষ্ট অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলতে লাগল, জানতাম চিনতা পারবানা। কিন্তুক ফয়সালাডা কি এতনা-ই সহজ?

অস্ফুট কাতরানি দিয়ে উঠল কনকতারা। সে শুধু ক্ষণিকের জন্যে। পরমুহূর্তে যন্ত্রনাদায়ক ঝাঁজালো গলায় বলল, তুমি ক্যারে আইলা! ক্যারে আইলা তুমি! উহ্!

ক্যারে আইলাম, দেখতা চাও?

কনকতারা ফিস্‌ফিস করে বলল, আমার সুখ-শান্তি সব নষ্ট করতা আইছ। উহ্, তুমি আমার শত্রু। তুমি ডাকাইত। তুমি খুন করতা পার, মাথা ফাডাইতা পার, জীবন নষ্ট করতা পার। মানে মানে ইরা যাও! ফিইরা যাও তুমি, নাইলে চেঁচাইয়া ডাকুম আমি সবাইরে! তুমি শত্রু!

বলতে বলতে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগল। তার বুকের সমস্ত পাঁজরা যেন একে একে ভেঙে গেছে। থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

অস্পষ্ট খুক্‌খুক্ করে হাসল শেখ ফরিদ। বলল, মানুষেরে আমি ডরাই না। জাননা আমি ডাকাইত!

উহ্, তুমি যাও! পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল কনকতারা।

অত সহজে না। বাঁ-হাতে ধরে হেঁচকা টানে সামনে দাঁড় করালো তাকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমারে ধোকা দা ভাবছ সুখ করবে! বেশ্যা মাগী কোথাকার! ছোডকাল থে আমারে তোমার মন দেও নাই? আমার চুমা খাও নাই? বুকে ঘুমাও নাই? তুমি ভাবছ ছাইড়া দিমু আর ঘরে গিয়া সুখ করবে! অয় তুমি বাঁচবে, না অয় আমি!

বাঁ-হাতে গর্দানে চাপ দিয়ে মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতটা বুকের কাছে তুলে ধরল। একটা ঝক্‌ঝকে ছুরি। কনক শব্দ করতে পারলনা, চেঁচাতে পারলনা ; একটু উহ্ করবার শক্তিও তার নেই। এভাবে দু'এক মিনিট কেটে গেল।

হঠাৎ পৈশাচিক শব্দে হেসে উঠল শেখ ফরিদ। ওর গর্দান ছেড়ে দিয়ে ছুরিটা গুঁজে নিল

কোমরে। অদ্ভুত মুখভঙ্গিতে বলল, না যাও। ছাইড়া দিলাম। তোমার মতন আরও অনেক মায়ামানুষ আছে দুনিয়াতে। যাও!

কনক আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ও আবার হাসল অস্বাভাবিক শব্দে। তারপর দেয়াল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহাকালের বোঁটা থেকে সূর্য আরো একটা দিনকে আনল ছিঁড়ে। গত কাল থেকে দূর তল্লাটের কামলারা জিরাত শুরু করেছে, গাঙের পার ঘেঁষে গড়ে উঠছে ছোট ছোট অনেক চালাঘর। বাঁশের দু'টো করে বেড়া জড়াজড়ি দাঁড় করিয়ে মেঝেয় ঘাসের ওপর কাঁথা-বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত।

কাক ডাকবার আগেই শেখ ফরিদ উঠে পড়ল ; মা কোনমতেই দিন চালাতে না পেরে ভিক্ষা করছিল এতদিন, তার আগমনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে ; সকাল নয়টা অবধি ঘুমোবে। সে ইচ্ছা করেই জাগাল না তাকে, খড়ম-জোড়াটা বারান্দায় রেখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। পূবের আশমানে সুবেহ সাদেকের আলোর আভা।

অনেকদিন পরে বলে নয়, কেন যেন সবকিছুই নতুন নতুন ঠেকছে। ভালো লাগছে ঝিরঝিরে বাতাস ভালো লাগছে রাস্তার ধারের কামিনী ফুলের গন্ধ। গত রাত্রিটা কেটে গেছে দুঃস্বপ্নের মতো ; তবু কোন জ্বালা নেই, অনুশোচনা নেই। বুকের ওপর থেকে যেন একটা দশমণি বোঝা নেমে গেছে।

গাঙের পার ধরে হেঁটে চলেছে শেখ ফরিদ।

কনকতারা। নূরমহল কনকতারা, নূরমহল আসল নাম কনকতারা ডাকনাম। হাঁ, একসঙ্গে কনক আর তারা দুটোই। কিন্তু এতো আসলে এক জাতের ধানের নাম। জোয়ানী পেরিয়েও শেখ আন্দু লোকটা রসিক ছিল বটে, না হলে সাতরাজ্যির নাম থুয়ে একমাত্র মেয়েটিকে দুনিয়াতে ধানের নামে পরিচিত করতে পারতনা। তাও আবার সূর্যমণি নয়, বাদশাহ-ভোগ, মোহন-ভোগ নয়—একেবারে কনকতারা। জনান্তিকে জানা গেছে, এই বিশেষ প্রকারের ধানের পিঠার ওপর লোকটার প্রচুর লোভ ছিল ; কেমন সোঁদালো একটা গন্ধ থাকে এর নতুন চালে যার সঙ্গে অন্যকিছুর তুলনাই হয়না। কিন্তু এই বিশেষ জাতের ধানের পিঠার সঙ্গে মেয়েটার ভিতরের মিল খুব বেশি নেই ; তবে সাদৃশ্য আছে রূপের রেখায়। কনকতারা ধান চিকন চিকন, কতকটা ঠিক তারই শরীরের মতো ; আর এর গায়ে যেন সূর্যের সোনালি লিখন, যার সঙ্গে ওর রঙের তুলনা মেলে। যৌবনে মুখে মুখে গান বানিয়ে গাইবার ক্ষমতা তাহলে শেখ আন্দুর মিছামিছিই ছিলনা, সবাইকে অবাক করে দিয়ে মেয়ের নাম রেখেছিল আজগুবি নতুন ধরণের। মুসলমানি নামটা অবশ্য দেয়া হয়েছিল, কিন্তু চর্চার অভাবে সেটা লোকে যেন ভুলেই গেছে।

মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়া কদম্বগাছের শিকড়টায় বসে পানিকে হাত বাড়ায় শেখ ফরিদ। পূবদিকে অজস্র লালরং ফুটে উঠেছে। মুখটা ধুয়ে নিলে হাঁটতে ভালো লাগবে।

ছোটবেলায় ওরা দু'জন খামারে ধান কুড়িয়ে বেড়াত ; ইঁদুরের গর্তে হাত ঢুকিয়ে ধানের গোছা টেনে বার করতে তার বীরত্বের অন্ত ছিলনা। একবার তো জান নিয়েই টানাটানি। হাত ঢুকিয়ে দিতেই ভেতর থেকে ফুঁস করে উঠল একটা সাপ। ভাগ্যিস কনক ছিল পাশে, সে এমন ক্ষিপ্রতায় তার হাত টেনে বার করে নিল, নিজের উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধে একটু আগেও এমন ধারণা তার ছিলনা।

পড়ো-ধান কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে বৌ-ভাত খেলতে কতই না আনন্দ। চারদিকে ঝাঁজাল জোছনা। লেপাপোছা উঠোনটা তক্‌তক্ করছে। তার একপাশে মেহেদী গাছের নিচে ছোট্ট চালাঘর। পাটশলার বেড়ার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে একটা

কিশোরী মেয়ে রান্নাবাড়ায় ভয়ানক ব্যস্ত। তার চেয়ে ছোট আরেকটা মেয়ে এটা-সেটা এগিয়ে দিচ্ছে ; তবু প্রতি মিনিটেই হম্বি তম্বির অন্ত নেই।

নুন নাই। মরিচ কই? না, তোরে নিয়া আর পারাই গেলনা দেখতাছি মাথায় খালি গোবর।

ওদিকে গৃহকর্তারও ব্যস্ততা অসীম। মাথায় গামছা বেঁধে এ বাড়িতে সে-বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেহমানদের তাড়া করে, রান্না শেষ। চলো শিগগির।

খাওয়া দাওয়া শেষে পান সুপারির পালা। তাও আবার ঘরের হলে চলবেনা ; কোন বাড়ির গাছ থেকে লোপাট করে আনতে হবে, সেখানেই তার বৈশিষ্ট্য, সেখানেই কৃতিত্ব। সবশেষে বিছানায় জড়াজড়ি করে শুয়ে যতরাজ্যির আজগুবি কিস্‌সা। রাক্ষস খোক্ষসের। দুধ সাগরের অথবা সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর। মেহেদী গাছের ডালগুলি ঝুলে পড়ত, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকত জোছনার ছায়ারা ; কখন ঘুমের দেশের রুপালি পানসি এসে তাদেরকে তুলে নিয়ে যেত টের পেতনা এতটুকু।

পৌষালি দিন। সারা মাঠ জুড়ে ধানকাটা শুরু হয়ে গেছে। যতদূর দেখা যা কেবল ধান আর ধান, ধানের আঁটির মিছিল। ঝাটা, কোদাল আর বেতের টুকরি নিয়ে বেরিয়েছে দু'জন। কথায় কথায় হাসির তুফান ছুটছে, মাঝে মাঝে মতবিরোধ দৌড়াদৌড়িতে পরিণত হচ্ছে ; হলদে কাপড়ে কনকতারাকে দেখাচ্ছে টিয়াপাখির মতো। ডাগর, বাড়ন্ত। ভারি সুন্দর লাগে। ক্ষুদে শেখটি পেছন থেকে দুষ্টামি করে খোঁপা খুলে দেয় তারপর চুলের গোছা ধরে হিড়হিড় করে টনে নিয়ে যায়।

আহ, ছাড়না!

সে খেমটা নাচের গান ধরে, ছাড়বোনা গো, ছাড়বোনা গো সই! তোমার কানে বিবাদ ছলে মনের কতা কই—

সন্ধ্যা নেমে আসে। সেদিন আর ধান কুড়ানো হয়না। কৃত্রিম রাগে কোদালটা কাঁধে ফেলে বুকটান করে ফরিদ এগিয়ে যায়, যেন তার সঙ্গে আর কেউ নেই। কিছুদূর গিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে পেছনটা তার একেবারে খালি, কেউ আসছেনা। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ায়।

শাসনের সুরে বলে, আমার অত ঠেহা নাই। থাক্ পইড়া। আমি যাইগা।

কোন সাড়া শব্দ নেই।

কাণ্ডডা দেখছনি? থাক্, আমার কি! বলে থপ্‌থপ্ করে আবার এগুতে থাকে। কিন্তু পায়ে যেন তেমন উৎসাহ নেই।

এই যে!

কই? ঘুরে দাড়ায়।

স্বর ভেসে আসে, এইযে এহানে!

কোদালটা বাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে ধানের স্তূপের আড়ালে খুঁজতে থাকে। কোথাও কেউ নেই। কেবল মাঝে মাঝে খিল্‌খিল্ হাসি, আর টুকরো টুকরো কথা। মেজাজটা আর বিগড়ে যায় আগাগোড়া কি করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে।

আবার খিল্‌খিল্ হাসি। এবার অনেক কাছে।

এই যে! এহানে!

সামনে এসে দাঁড়ায় কনক। ফোঁপানি বন্ধ করে দু'হাতে তার মুখটা তুলে ধরে সে। কোনো শব্দ নেই, কোন কথা নেই। তার চোখ থেকে টপ্‌টপ্ পানি ঝরে!

অনেকক্ষণ পর বলে, না তুমি কোনহানে না, এইহানে!

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বুকটা। তার গলা জড়িয়ে ধরে কনক নিচুগলায় বলে, আমারে ছাইড়া যাইওনা।

এরপর হঠাৎ একসঙ্গে দু'জন হো হো করে হেসে ওঠে। পরস্পর কাঁধে ধরে দ্রুতপদে চলতে থাকে বাড়ির দিকে।

এইসব মনে আসার কথা নয়, বিশেষ করে আজকের অবস্থায়। তবু আসে। একি শুধু কপালের লেখন, না অন্যকিছু? তার চাওয়া তো খুব বেশি ছিলনা, এতবড় দুনিয়ার বুকে একটি নিরালা বাসা, যেখানে হৃদয়ের সকল মাধুর্যকে উজাড় করে দেয়ার এতটুকু বাধা থাকবেনা। কোন অভাব যদি থাকতও, জীবনে তা বিষ ছড়াতে পারতনা ; কারণ মন দিয়ে মন সেখানে পাওয়া যেত। কিন্তু সব আশাই আজ তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছে। যাকে সমস্ত জীবন সঁপে দিয়েছিল সেই করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। কি ছলনাময়ী আওরতের জাতটা! কি জঘন্য শয়তান। একটা জীবনকে নষ্ট করে দিয়ে নিজে মজাসে অন্যলোকের সঙ্গে সংসার পেতেছে!

বিদেশী কামলাদের চালার সামনে দুর্বায় বসে একটা ডাবা চেয়ে নিয়ে টানতে থাকে শেখ ফরিদ। আলাপ জমিয়ে ওদের নাম-ঠিকানা জেনে নেয়। কিন্তু সবই চলেছে অনিচ্ছায়। তার মস্তিষ্কে অন্য ভাবনা ঘোরপাক খাচ্ছে।

সূর্য বেশ কিছুটা ওপরে উঠেছে। লোক চলাচল শুরু হয়েছে রাস্তায়, অনেক আগেই। ধানক্ষেতগুলো অফুরন্ত কিরণে গা মেলে দিয়েছে, অনেককালের পিপাসা যেন মিটিয়ে নিচ্ছে একদিনেই। শেখ ফরিদের ধূমপানেও যেন তৃপ্তি নেই, ঘাড় গুঁজে টেনেই চলেছে সে। হন্তদন্ত হয়ে এসে পেছন দিক থেকে ডাবাটা বেয়াদবের মতো টেনে নিল করমালি। সে দেওয়ান-বাড়ির বছুরে মুনি। দম কষে দুতিনটে টান দেয়ার পর নিজে থেকেই বলতে লাগল, কিছু মনে কইরোনা, আমার তাড়া আছে। বাজারে যাইতে অইছে কাফনের কাপড়ের লাইগা। কি মুশকিল রে বাপ, নয়া বৌডা মইরা গেল ফাঁস লইয়া! কি দুখটা তার আছিন্? বড়বাড়ি, টেহা আছে, পইসা আছে! হায় অভাগীব বেডি!

হুঁকোটা ফেরৎ দিতে দিয়ে সে আঁৎকে উঠল, আরে ফরিদ যে, কহন আইলে! কি খবর?

শেখ ফরিদ কোন জবাব দেয়না তার কথার। পলকে তার চেহারা পুরোপুরি বদলে গেছে। তার কাঁধে চাপ দিয়ে জিগগেস করল, কি কইলি তুই!

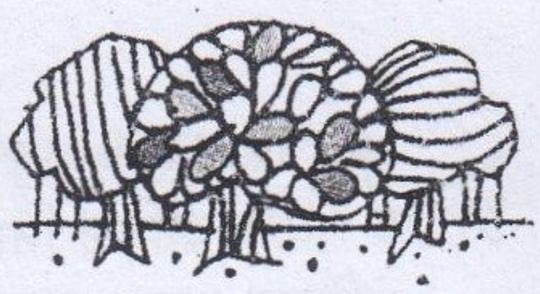
একটু আগে কি কইল!

—ঠিকই কইছি ভাই! ভেজা গলায় কবমালি বলল, কি পাষানী মায়ারে! গলায় ফাঁস নিয়া মইয়া গেল!

সারাদিন কোথায় কি ভাবে কাটাল তার খেয়াল নেই। রাত্রি যখন গভীর হল, কবরের কাছে এসে দাঁড়াল শেখ ফরিদ, নিশাচর প্রেতের মতো। বাঁশপাতা মৃদু বাতাসে নড়ছে। করুণ নাকিসুরে ডাকছে একটা নাম-না-জানা পাখি। এক অজ্ঞাত মুহূর্তে গোরের ওপর লুটিয়ে পড়ে গলা-কাটা মোরগের মতো হাত পা ছুঁড়তে লাগল; মাথা ঠুকে ঠুকে মাটি উপড়িয়ে ফেলল অনেক। ভাঙা কাচ, আর কাঁকরের ঘা লেগে রক্ত ছুটেছে কপালে, চোখমুখ একাকার। হঠাৎ এক সময় সটান দাঁড়িয়ে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটতে লাগল সামনের দিকে, মাঠের ওপর দিয়ে, পাকা ধানক্ষেত মাড়িয়ে। সে চিৎকার অনেকদূরে, দিগন্তে জাগাল প্রতিধ্বনি।

নভেম্বর ১৯৫১

রোগমুক্তির ইতিবৃত্ত



এইতো, নানাকাজের ফাঁকে ফাঁকে কত ভেবেছি ঘটনাটা কারো না কারো কাছে বর্ণনা করব। ভরতি চা'য়ের কাপ অজানতেই শেষ হয়েছে, বিড়ি পুড়তে পুড়তে লেগেছে আঙুলের চামড়ায়, অনেক কথা বলেছি আর অনেক বলতে শুনেছি কিন্তু সে-কথা এখনো কারো কাছে বলা হল না। অথচ প্রকাশ না করলে আমার সঙ্গে সঙ্গে সে-কাহিনীরও শেষ।

এদিকে পুরনো বুকের ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে। এইতো গতকাল রাত বারোটায় যখন প্রেস থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, গলাটা খুস্‌খুস্‌ করে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাশলাম। পাঁজরগুলো ভাঙা হারমোনিয়ামের মত বাজল। কানে হিহি হাওয়া। উরুর কাছে পায়জামাটা যেভাবে ছিঁড়ে গেছে, তার এক জানালায়ই সারাশরীর হিম। রাতে ঘুম এল না চোখের পাতার কাছটিতে। বস্তির ধারে কুকুরটা বারবার খেঁকিয়ে উঠল, ভোররাতে ঘোড়াগাড়ির চাকা গড়িয়ে গেলো ইস্টিশনের দিকে। কোরবান আলির রিকশা ক্রিং করে উঠল। সকালে মুখ ধোয়ার আগে আমি আবার কাশলাম, ফুসফুসের কাছে চিনচিনে ব্যথা ; গায়ের জোরে খাকরানি দিয়ে কাশ ফেললাম, চোখজোড়া কপালে উঠল। দেখলাম, কফে জড়ানো রক্ত।

এরপর আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, বুঝলাম বলতেই হবে আমাকে গল্পটা এবার।

যখনকার কথা বলছি, সেবারেও এমনি অসুখ করেছিল। মনে পড়ে তখন টেলিপ্রিন্টার চলছে ছটাং ছটাং ছট্‌ছট্‌। গ্রুফরীডারের তাড়া। আমি কম্পোজহ করছিলাম, মার্কিন সিনেটের বক্তৃতা, এশিয়ার বড়ো বড়ো নগরীগুলোকে ধ্বংস করতে দশটার বেশি আণবিক বোমার দরকার পড়বে না! অর্ধেকটা কম্পোজ হয়েছিল, হঠাৎ ঝনাৎ করে লীডগুলো টাইপকেসের ওপর পড়ে গেল।

কি হলো তোমার? শব্দ শুনে, মমতাজ আলি জিগগেস করল। আমার মুখ থেকে কোন জওয়াব বেরুল না, সারা শরীর কাঁপছে। কালে হাত দিয়ে সে আঁৎকে উঠল একি! দেখছি ভয়ানক জ্বর! এরকম অসুখ নিয়ে তুমি কাজ করতে এলে কেন? চল্‌, চল।

চলন্ত প্রেসের ধাতব আওয়াজ ছেঁড়া ছেঁড়া কথাবার্তা, সবই আমার কানে বাজে দুঃস্বপ্নের মতো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। একটা বিরাট প্রলয়কাণ্ড, একটা প্রচণ্ড অতি মানবীয় কল্পনা, কাল-বৈশাখী ঝড়ের উন্মত্ততা, মাথার ভিতরে টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। এরপর সবই বিস্মৃতির অন্ধকারে। চোখ খুলে দেখলাম আমি হাসপাতালে। চার নম্বর ওয়ার্ড, সতেরো নম্বর বেড। চারপাশে মুমূর্ষু রোগীদের ছট্‌ফটানি, চাপা কাতরানি।

শিয়রের দিকে দুটো বেডের মাঝখানটিতে বড়ো জানালা। তারের জালে ছাওয়া। একটু কাত হয়ে শুলে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়া যায়। দেখার জিনিশের অভাব নেই। নীল আকাশ ছাড়াও কয়েকটি বিদেশী গাছ। পাতায় পাতায় সবুজের জোয়ার এসেছে। বসন্তকাল আসতে বোধ হয় বেশি দেরি নেই। সন্ধ্যার দিকে দু'একটি পাখি কতকক্ষণ অনাবশ্যক কিচিরমিচির করে গেছে। ডালগুলো কেঁপেছে হাওযায়। এমন সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মন ওদের নেই, তবু আমি কান খাড়া করে মুনলাম আনন্দকাকলি। কারণ ছাত্রজীবনে পাখি জাতটাকে খুবই ভালবাসতাম। এবং তাদের গানও। ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলার পাখির ওপর রচনা লিখে পঁচিশের জায়গায় উনিশ নম্বর পেয়েছিলাম। আর তাই ছিল সর্বোচ্চ মার্ক।

ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে এসেছিল, কানে গেল একটি মিষ্টি আওয়াজ, এই যে! ঘুমিয়ে পড়েছেন?

কে? আমি তাকালাম, দেখি একজন সিস্টার।

ওষুধটা খেয়ে নিন্। কাচের টাই গেলাসটা বাড়িয়ে দিলেন।

জানতাম, আমাদের সমাজে সেবিকাদের সম্পর্কে ধারণা অদ্ভুত। তার জের আমার মধ্যেও ছিল না এমন নয়। তবু শত হলেও মেয়ে। আর আমার সামনে যে, এমনি তার রূপ, তা'তে যে কোন যুবক মন হারালে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। ধবধবে সাদা পোশাকটা মানিয়েছে বেশ। কোমরের ওপর দিকটায় কাপড়ের বেল্ট আঁটা, শাড়ির পাড় ফিকে নীল। মাথার চুলগুলো সযত্নে আঁচড়ানো বেণীবাঁধা খোঁপা। মুখখানা গম্ভীর, শান্ত। চোখজোড়া কী এক সুদূর চিন্তার গভীরে যেন আচ্ছন্ন।

তাকে দেখতে দেখতে আমি কখন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম তা লক্ষ্য করে আরেক চোখে ছোট একটা কটাক্ষ হেনে চলে গেল।

মেয়েদের নিয়ে ভাবনায় রোমাঞ্চ থাকলেও শরীরের ক্রম-ক্ষয়িষ্ণুতা সকল-কল্পনাকে উড়িয়ে দেয়। তিলে তিলে মৃত্যুর পথে চলেছি, এ আমার উপলব্ধি, তবু ছোট ছোট বিদ্রোহের কণা জমাট বাঁধে। দৈনিক চারবেলা যা পথ্য দেয় দেখলেই সন্তুষ্ট। সারাদিনে একটিমাত্র পাউরুটি, তাও আবার ভোটকা, পথ্যের ফলমূলগুলো আরো ওমদা, কণ্ট্রাক্টর থেকে বয় পর্যন্ত এতসব হাত ফসকে রোগীর সামনে আসে যে শেষ পর্যন্ত অপরূপ। ওষুধের ব্যাপার আরো একভারী।

বেশীর ভাগ রোগীর মতো, আমারও কোনো পরিচিতি, কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা নেই, তাই লক্ষ্য করলাম, দিন দিন আমার গাল বসেই যাচ্ছে, পাঁজরের হাড়গুলো ফুটেই উঠছে, বুকের চামড়া ভেদ করে জ্বরের ডিগ্রি বেড়েই চলছে।

সেদিন রাত তিনটেয় জ্বর এল। কপালের দু'পাশের রগদুটো ছট্‌ছট্ করছিল, মগজে ভিতরে একটি রেলগাড়ি যেন শত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। তখন কেউ জেগে নেই, ডিউটির নার্সও হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। যতক্ষণ পারলাম, চেতনাকে জাগিয়ে রাখলাম। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। যখন চোখ চাইলাম, সকাল নয়টা, কপালে স্নিগ্ধতার আমেজ। চুলভেজা। অসাবধানে পানির ক্ষীণধারা ঘাড় বেয়ে আমার পিঠ ভিজিয়েছে। অস্থি-মাংস, কে যেন দরমুজ দিয়ে পিটিয়ে রেখেছে।

কেমন লাগছে এখন? পাশের পেসেন্টের কাছ থেকে এসে সেই সিস্টার জিগগেস করলেন, হাত বাড়িয়ে বললেন, এই নিন্ বড়িদুটো খেয়ে নিন।

আমি হাত বাড়িয়ে নিলাম। বললাম, বড়ি খেয়ে আর কি হবে!

উনি চুপ। আমি লক্ষ্য করেছি, অত্যন্ত কম কথা বলেন। যা বলেন তাও যেন অনিচ্ছায়। কর্তব্যের খাতিরে। তাঁর মুখের রেখায় কোনদিন স্বাচ্ছন্দ্যের আভা ফুটে উঠতে দেখিনি, দেখিনি কোনো চাঞ্চল্যের প্লাবন। সব সময়ই যেন কি ভাবছেন। গভীর কিছু, সুদূরের কিছু। তাই ইতস্তত করে ডাকলাম, এদিকে এটু শুনবেন কি?

খট্‌খট্ শব্দে সিস্টার কাছে এলেন, বললেন, কি বলুন।

আমাকে যদি একটা পোস্টকার্ড যোগাড় করে দেন, তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। জমাদারকে দিয়ে আনাতে পারতাম, কিন্তু আমার কাছে—

ঠিক আছে—উনি বললেন, আমি ব্যবস্থা করছি।

আপন মনেই আমি বিড়বিড় করলাম,একটা চিঠি লিখে দেখি, গ্রামে কোন খবর

পেয়েছে কিনা। অন্তত মা'কে যদি জানাতে পারতাম।

সিস্টার একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর চুপ থেকেই চলে গেলেন।

বিকেলে ওষুধ খাওয়ার সময় পোষ্টকার্ড পেলাম। একটু হেসে বললাম, কিছু মনে করবেন না—আপনদের বাড়ি কোথায়?

এইতো এদেশেই উনি জবাব দিলেন, কিসের জন্যে, আপনার?

এককালে ছিল কলকাতায়, আপাতত নেই। আমি বলতে লাগলাম, দাঙ্গার সময় কে কোথায় ছিটকে পড়ি। আমরা ছিলাম দু'ভাই বোন, আর আমাদের আব্বা—আম্মা। কলেজ থেকে এসে কাউকে বাসায় পাইনি। কে একজন বললে, চলে গেছে পাকিস্তানে। প্রথমটায় আমার বিশ্বাস হল না। আমাকে রেখেই কি তারা চলে যাবেন? এক বন্ধুর সাহায্যে রিফুইজি ক্যাম্পে খোঁজাখুঁজি করলাম। পেলাম না। এদিকে অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। অগত্যা প্রাণের ভয়ে কোনমতে পালিয়ে এলাম এখানে। পকেটে একটি ফুটো পয়সাও নেই। পেটের দায়ে কতজনের হাত পা ধরে প্রেসে কাজ নিলাম। তিনমাস লেগেছে কাজ শিখতেই, কেবল খাওয়া পেয়েছি। এখন কিছু বেতন—

সিস্টার কঠিন মুখে বললেন, কিন্তু আপনি ওখান থেকে পালিয়ে এলেন কেন?

প্রশ্ন শুনে অপ্রস্তুত। থতমত খেয়ে জওয়াব দিলাম, বলেন কি, আসবো না?

কেন আসবেন? ওটা আপনার জন্মভূমি! সেখানে জীবনযাপন করার অধিকার আপনার রয়েছে। কারা রায়ট করছে আপনারা জানেন, কারা কিসের জন্যে হিন্দু—মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি করছে তাও হয়ত অজ্ঞাত নয়। আপনারা রুখে দাঁড়াতে পারলেন না?

কথাগুলোকে বক্তৃতা বলে উপেক্ষা করতে পারতাম, যদি না তাঁর ঠোঁটে থাকত ফিস্‌ফিস্ উচ্ছ্বাস, যদি না তাঁর কণ্ঠে থাকত আশ্চর্য দরদ। বিশেষ করে, এ বক্তৃতা দেয়ার পরিবেশ নয়, সময়ও নয়।

আমি বললাম, আপনি ঠিক বলছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় এসবের কিছুই মনে থাকে না। তখন প্রাণের দায়টাই বড় হয়ে ওঠে কিনা!

প্রাণটা কি আদর্শের চাইতে বড়ো? সত্যের জন্যে প্রাণ দিয়ে দেশবাসীর সামনে তো একটা নজীরও তুলে ধরতে পারতেন! নিজেকে যেন সামলে নিলেন, বললেন, কই, আমি তো এখান থেকে পালিয়ে যাইনি। আমার কি প্রাণের ভয় ছিল না?

তাহলে আপনি কি— বিস্ময়াবিষ্ট আমার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, ততক্ষণে সিস্টার অনেকদূর চলে গেছেন।

শুনেছিলাম, নারী রহস্যময়ী। কিন্তু এ-মেয়েটার মাঝে যে-রহস্য তা কেবল তার নারীত্বের জন্যেই যেন নয়, আরো গভীরে তার অবস্থান। রীতিমত ভাবিয়ে তুলল।

সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। চব্বিশ নম্বর হঠাৎ খক্‌খক্ করে কেশে উঠে সব চিন্তার জাল ছিন্ন করে দিল। তার কাছে আরো দু'জন জড়ো হয়েছে। তাঁরা কি বলাবলি করল ফিসফিসিয়ে। চেষ্টা করেও বোঝা গেল না। যে যার বেডে গিয়ে দুটো করে পয়সা এনে দিল একুশ নম্বরের হাতে। আশে পাশে কর্তৃপক্ষের কেউ ছিল না। পয়সাগুলো বার তিনেক গুণে সে টেকে গুঁজল।

আমার বেডের কাছ দিয়েই সে বাইরে যাচ্ছিল। ডাক দিলাম, এই মিঞা, কই যাও?

বাইরে। একটু হকচকিয়ে যায় একুশ নম্বর।

আমি বললাম, সেতো দেখতেই পাচ্ছে, কি জন্য যাচ্ছ?

আপনে কইয়া দিবেন না তো? খোদার কসম! এদিক ওদিক তাকিয়ে কাছে মুখ এনে

সে বলল, বিড়ি আনতাম যাই! আপনে পইসা দিবেন?

এতদিনে ধূমপানের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অথচ এককালে রোজ দুই প্যাক সিগারেটেও কুলিয়ে উঠত না। লোকটার কথার কাঠি আমার পুরনো নেশাটাকে উসকে দিল। চুপি চুপি বললাম, পয়সা নাই আমারে একটা দিও!

আইচ্ছা! আপনে কারু কাছে কইবেন না যেন! কইলে আমরা নাম কাইটা দিব। বাইরে বার কইরা দিলে খামু কি?

তাহলে হাসপাতাল চিকিৎসা কেন্দ্র নয়। থাকা খাওয়ার আশ্রয়!

গতানুগতিক দশটা উৎরে গেল। বেডে বেডে মশারি খাটিয়ে দেয়া হয়েছে। ওয়ার্ডের দু'দিককার সব বাতি অফ করানো, কেবল মাঝখানটায় নার্সের টেবিলের ওপর একটা বাল্‌ব জ্বলছে। মেদবহুল প্রৌঢ়া দিদিমণি এতক্ষণ ডিউটি দিচ্ছিলেন। আজ রাতে কে আসবে জানি না, চলে যাওয়ার পর একুশ নম্বর মশারির ফাঁকে একটা বিড়ি দিল। কতক্ষণ পর আগুনও নিয়ে আসে। সাবধানে পার্টিশন দেওয়া কামরাটার দিকে দৃষ্টি রেখে একেকটা টান দিতে লাগলাম। উভয় দিকটা শান্ত, একেবারে চুপচাপ। আবছা অন্ধকারে নিরুত্তাপ শীতলতা নেমে এসেছে।

অনুভব করলাম, মশারির পাশে কে একজন।

বিড়িটা লুকিয়ে ফেলার আগেই সে কণ্ঠস্বর, থাক্ থাক্। এমন পবিত্র কাজটা করছেন!

লজ্জিত হলাম। কোন কথাই মুখে এল না। বিড়ির শেষাংশটুকু খাটিয়ার নিচেকার গামলায় ফেলে দিয়ে সহজ হতে চাইলাম। কিন্তু বৃথাই এ-সব। অজ্ঞাতেই কখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়ে গেছে। টর্চের আলো ফেলে চলে গিয়ে আমাকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিলেন।

একটা বাজলো। ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চোখের পাতায় তন্দ্রার আঁশটুকুও জড়াল না। একটু পরপর জুতোর হিলের খুট্‌খুট্ আওয়াজ। এত মৃদু এই শব্দ তবু আমার কানে তা স্পষ্ট হয়ে বাজে, কাছে এলে স্পষ্টতর হয়। আমার বুকের স্পন্দনে এই শব্দ যেন আশ্চর্য মিল খুঁজে পেয়েছে। বুকটা ধুক্‌ধুক্ করছিল। একবার আমার বেডের কাছ দিয়ে পাস করার সময় সাহস করে কথা বললাম, একটু শুনবেন কি সিস্টার।

একি এখনো আপনি সজাগ! উনি থমকে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করলেন।

জ্বি হাঁ ঘুম আসছে না। তাছাড়া, অনেকের জন্যে আপনারা সারারাত জাগতে পারবেন, আমি নিজের জন্যও পারবনা?

কিন্তু অসুখটা যে বেড়ে যাবে, সেদিকে খেয়াল আছে?

তা আছে। তবু একটা কথা আমার মনের ভিতরে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। তা না বলে পারছি না। বললে কিছু মনে করবেন না তো?

না। শান্তস্বরে সিস্টার বললেন, বলুন।

আপনাকে আমার খুবই ভাল লেগেছে! আমি বললাম, আপনাকে আমি—

আমি জানতাম, এ মামুলী ধরনের পুরনো কথা যুগে যুগে অনেক ছেলেই অনেক মেয়ের কাছে বলেছে। তবু কথাটায় যে আবেগ তা আমার একান্ত আপন। আমার মনের, আমার সমগ্র অনুভূতির। আর তা-ই হয়তো তাকে কিছুক্ষণের জন্য মূক করে দিল। চুপচাপ শুনলেন। অবশেষে বললেন, আপনাকে আমি মনে রাখব! আর সত্যিকারভাবে অনুভব করেই যদি কথাটা বলে থাকেন, তাহলে আরও কিছু বলবো, আপনি দেশে ফিরে যান। আব্বা আম্মাকে খুঁজে বার করুন! জীবনটাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করুন। যদি করতে পারেন, তাহলেই বুঝবো আমাকে যে আপনার ভাল লেগেছে তা নিছক

সেন্টিমেন্টাল নয়!

আমিও চুপ করে থাকলাম না। আবেগের সঙ্গে বললাম, আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করব না। তোমাকে আমি ভালবাসি।

রাত পোহাতে চলল। আর এদিকে আমার জীবনের বিরাট এক বিপ্লব ঘটে গেল যা কোনদিন কল্পনাও করিনি, এমনি দুঃসাহস সঞ্চারিত হল সারা চেতনায়। এর সাথে মনে গেঁথে রইল একখানা শান্ত মুখ।

না, গল্প এখানেই শেষ হয়নি। এরপরও রয়েছে, আর তা আমাকেই বলতে হবে। এরপর আর দশজন রোগীর মতো আমারও এল। জ্বর ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু শরীরটাকে বানিয়ে গেল কংকাল। ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন, পেসেন্ট কিউর্‌ড। মনে মনে বললাম, তথাস্তু। বাতাসে উড়তে উড়তে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম।

বিদায়ের দিন ইচ্ছা করেই দেখা করিনি, ভেবেছিলাম সহ্য করতে পারব না। তবু প্রতি মুহূর্তেই মনে পড়েছে।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে অনেকবার প্রদক্ষিণ করেছে। দেশে আমার যাওয়া হয়নি। এতদিনে আমার সমস্ত সুকুমার অনুভূতিগুলো চুপসে গিয়ে বন্দী হয়েছে টাইপের কেসে, সিসের চকচকে লীড ঢুকে গেছে মগজে। কত খবরই না কম্পোজ করলাম, কোথায় ডিনার পার্টি হচ্ছে, জলসায় বরেণ্যনেতা কী বললেন, যুদ্ধের হুমকি ছড়ানো কত ধরনের বক্তৃতা! মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরদের সংখ্যা টাইপে রূপায়িত করতে আমার আঙুল কতবার কেঁপে গেছে। পৃথিবীটা ঘটনার তরঙ্গ তুলে আঁকাবাঁকা স্রোতে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেছে, অনেক খবরই আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু কোন খবরই মনে নেই। যান্ত্রিক গতিতে স্মৃতির চাকাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে কখন ঝরে পড়েছে, নিজেই বলতে পারব না।

অনেকদিন পর তার কথা মনে পড়ল। আমার প্রতিশ্রুতির কথাও।

বহু ইতস্ততার পর মনস্থ করলাম তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

জানি না ভুলে গেছেন কিনা, রোববার বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার কোন পাত্তা মিলল না। সেই মোটা দিদিমণির কাছে অনুসন্ধান নিয়ে যা জানতে পারলাম, তার মর্মকথা হচ্ছে, সিস্টার নেই। এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু বললেন।

সে ঘটনাগুলো সাজালে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়। তার নাম মনীষা। সম্পন্ন ঘরের না হলেও তার পূর্বপুরুষদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তার কাছে ছিল গৌরবের বস্তু। তার ঠাকুরদা অগ্নিযুগের অখ্যাতনামা বিপ্লবীদের একজন। বাবা ছিলেন বিজ্ঞানের প্রফেসর। একদিন ল্যাবরেটরীতে কী এক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, এক অদ্ভুত ধরনের গ্যাস তাঁর চোখে লাগে। বাইরের দিক থেকে কিছু ক্ষতি হলনা, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল চিরতরে।

দৃষ্টিশক্তির অভাবে কাজে অক্ষমতা। তার চাকরি গেল।

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও। মনে করেছিলেন, মেয়েকে সায়েন্স পড়াবেন। এদেশে মহিলা বৈজ্ঞানিক নেই। তাঁর ধারণা ছিল, মেয়ের যা প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সহনশীলতা, তাতে ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই অন্তত একজনের অভাব পূরণ করতে পারবে। তখন মাত্র প্রথমবর্ষের ছাত্রী।

একটি ছেলে তার বাবার ল্যাবরেটরীতে কাজ করত। পয়সাওয়ালা লোকের একমাত্র

সন্তান। বাপ-মা নাম রেখেছিলেন, অশোক। কিন্তু পঁচিশ বৎসর কেটে যাওয়ার পরও তারা ওর চরিত্রে মহামতি সম্রাটের কোন গুণাবলীই আবিষ্কার করতে পারেননি। লোকে বলে ইউনিভার্সিটির রিসার্চ স্টুডেন্ট, আর তারা বলেন গোল্লায় যাওয়া ছেলে। যতসব ছোটলোকদের সঙ্গে মেলামেশা। বাপ তাকে বাড়িতে আমলই দিতে চান না। মা আছেন, তাই আড়ালে-আবডালে তার মমতার আঙুল বেয়ে কিছু কিছু নোট হাতে এসে পড়ত। যতদিন পকেটে থাকে, তার দেখা নেই। হয় ল্যাবরেটরীতে না হয় শহরতলীর কৃষিক্ষেত্রে। দেদার সিগারেট ফোঁকে আর চিবায় বাদাম। এ দুটো জিনিশ হলে তার ভাত না হলেও চলে।

সে দিন কী বার ছিল, সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির।

ডাকাডাকি শুরু করে দিল, ও মণি, মণি! মণীষা তুমি কোথায়?

কি! মনীষা বাবার জন্য মাফলার বুনছিল আলো জ্বেলে।

এসোনা লক্ষীটি একটু দেখে যাও।

কাছে এসে মনীষা বলল, আর পারি না বাবা! কী হয়েছে বল।

এক মুঠা শাক বাড়িয়ে দিয়ে অশোক বলল, এই দ্যাখ কমলীর মা কী দিয়েছে! এর নাম কলমীলতা। পুকুরে জন্মে। খুব পুষ্টিকর জিনিশ। ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে! একটু রেঁধে দাওনা আমি ভাত খাব।

আমাকে তোমার গিন্নি পেয়েছ নাকি? হঠাৎ কথাটা বলে পেলে মনীষা কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল। তার মুখে রক্তিমাভা।

একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশোক বলল, এমন ভাগ্য কি আমার হবে রে!

এমনি ধরণের অনেক মুহূর্ত গিয়েছে। অজান্তেই ছোঁয়া লেগেছে তাদের মনে। বুড়ো প্রফেসরের দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায়নি, যদিও তিনি দেখতে পান না। তাঁর পাশে তিনি দু'জনের উপস্থিতি অনুভব করেছেন, তাদের হাসির দু'একটি টুকরো তাঁর কানে লেগেছে। মনে মনে হেসেছেন। মনীষা ছাড়বার পাত্রী নয়। সহজ কথা সহজভাবে বলা তার অভ্যাস। বিজ্ঞান সকল সংস্কারকে ঝেঁটিয়ে দিয়ে তার চেতনাকে শাণিত করে তুলেছে। যা সত্য, তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে তার এতটুকু কুণ্ঠা নেই, যা মিথ্যা তার বিরুদ্ধে কথা বলায় তার অপরিসীম সাহসিকতা। জীবনটা তার কাছে সরল।

শ্রাবণের বিকেল। জানালার বাইরে বৃষ্টি।

অশোক গান জানে না, তবু গুন্‌গুন্‌ করছিল। অবশেষে বললে, মণি একটা গান গাও না! অনুরোধ করছি।

আমার গান তোমার ভাল লাগবে? মৃদু হেসে টিপপনি কাটে, বিজ্ঞানী মানুষ!

বিজ্ঞানীরা কি শিল্পরসিক হয় না? অশোক বলল, জানো? আইনস্টাইন বেহালা বাজান?

মনীষা রবীন্দ্রসংগীত গাইলো ঃ এমন দিনে তারে বলা যায়। ওদিকে আকাশে মেঘের গুরুগুরু ডাক। সারাটা রাস্তা ভিজে গেছে। নর্দমায় গড়িয়ে পড়ছে জলধারা। চারদিকে এক ঝর্‌ঝর্‌ মুখরতা। অশোক তন্ময় হয়ে শুনলো গান। শেষ হয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বলে উঠল, শেষ হয়ে গেছে! উঃ চমৎকার। আজকের মত তোমার গলা এত ভাল লাগেনি কোনদিন।

বাইরের দিকে চেয়ে রইলো মনীষা, পরে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বলল, আচ্ছা, অশোকদা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

কি এমন কথা? জিগগেস কর না?

তুমি আমাকে ভালবাসো? আশ্চর্য সহজ ওর কণ্ঠস্বর।

অশোক শান্তকণ্ঠে জওয়াব দিল, হাঁ।

তাহলে আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়াটাই ঠিক।

আমার আপত্তি নেই। তবে একটা কথা, আমার বাপ মা যদি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন তখন আমার শক্তিকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে তো?

তুমি আশীর্বাদ করো!

দুটি মনের নীড় বাঁধার কানাকানি। নির্জন বনচ্ছায়ার ঘন পাতার আড়ালে নয়, রৌদ্রদীপ্ত সতেজ শাখায়, খোলা হাওয়ায়। কিন্তু ওরা জানত না, ওদিকে উত্তরের সমস্ত পাহাড়ের শিখরে শিখরে ঝড়ো মেঘ ঘনায়িত হয়ে উঠেছিল, তার স্তব্ধ কঠিন মূর্তি চাঞ্চল্য জাগাল নদীর বাঁকের কুটিল ঢেউয়ে। সে-ঢেউয়ে ডুবল পঞ্চনদীর দেশ। দিল্লী এক্সপ্রেস তার কাঠের শরীরে নিয়ে এল তাজা রক্তের ছিটে, গমের শীষে শীষে তারই আতঙ্ক কাঁপুনি। আগুন জ্বলল নোয়াখালীতে, ভুট্টার দেশে তারই ফুলকির ভ্রুকুটি। কত ঘর ভাঙল! শিশু কণ্ঠের আর্তচিৎকারে আসমান বিদীর্ণ, নারীর ভয়ার্ত চাউনিতে রোম ধ্বংসের প্রতিচ্ছায়া। তারই পৈশাচিক অট্টহাস্য মহানগরীর রাস্তায়। ল্যাম্পপোস্টের ধারে, রেলওয়ে ক্রসিংয়ে, বস্তির নোঙরা গলিতেও। রাত্রির অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে করুণ কান্নার শব্দে এম্বুলেন্স ছুটোছুটি করে। তার পাটাতনে লাশ, আঁঠালো রক্ত। চাপা কাতরানি। আণ্ডার ড্রেন ভরে ওঠে পচা দুর্গন্ধে।

নীড় তাদের বাঁধা হল না।

তারা দেখল, সমাজের শাখাগুলো মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে। এখানে আশা নেই, ভাষা নেই, বিশ্বাস নেই। পুলিশের সঙ্গিনে মানবতার মানদণ্ড।

একি আত্মহত্যার সামিল নয়? অশোক উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট থেকে আত্মবিশ্বাসের কাঠিন্য ফুটে বেরুচ্ছে।

তা হোক। তবু তোমার কথা কে শুনবে? মনীষা ব্যথিত কণ্ঠে জওয়াব দিল, খুনের বদলা কুন, এ তো পুরনো নীতি। এ-দেশ সেই নীতিকেই কার্যে পরিণত করছে।

কিন্তু তুমি জান না, সাধারণ মানুষ এ চায় না। যারা শিশুর মুখে দু'ফোঁটা দুধ তুলে দিতে পারে না, যারা বৌকে কাপড় দিতে পারেনা রাত না পোহাতে যারা পেটের দায় টানে, তারা এসবকে ঘৃণা করে। আজ সাতদিন ধরে তারা রাস্তায় বেরুতে পারছে না, কতজন ভুখা রয়েছে তার হিসাব কে রাখে! তারা বোঝে, রায়টা কারা বাঁধাচ্ছে। আরো বুঝিয়ে বলতে হবে।

মনীষা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, একি যাচ্ছ কোথায়?

হাঁ আমাকে যেতে হচ্ছে। অশোক দাঁড়িয়ে বলল, মিটিং আছে।

মিটিং! তুমি কি পাগল হয়েছ? ওর হাত টেনে ধরে বলল, আমি যেতে দেবনা।

অশোক শান্তস্বরে বলল, ছি মনীষা, তুমি তো আমাকে ভাল করেই জানো। আমাকে বাধা দেয়ার বৃথা চেষ্টা করো না।

ওর সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। ফ্যাকাশে চোখমুখ। কি বলতে গিয়ে গলায় আটকে গেল সবকথা। অশোক হাত ছাড়িয়ে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেছে। দুয়ারের কড়াটা তখনো নড়ছে। সেদিকে চেয়ে অস্বস্তিতে বসে পড়ল মনীষা। এরপর কি হবে?

দোতলার একটা জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল ঃ রাস্তায় লোকজন নেই। ক্রসিংয়ের মোড়ে রাইফেল হাতে কয়েকটা বিহারী সেপাই। জট্‌লা করছে। মাঝে মাঝে পুলিশভ্যান ক্ষিপ্রগতিতে টহল দিয়ে যায়। চাকার শব্দে জান্তব উত্তেজনা। বিকালের সূর্য উঁচু

দালানটার আড়ালে। তার রশ্মি ওপরের ক্লান্তমেঘে প্রতিহত। মনীষা দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ফ্রেমে আঁটা ম্যাডোনার মতো। কিন্তু তার ঠোঁটের কোণায় সে ছবির স্নিগ্ধ হাসিটুকু নেই। ভারাক্রান্ত থমথমে মুখমণ্ডলে নিষ্ঠুর সময়ের প্রেতচ্ছায়া। কি সে ভাবছে? হয়ত অনেক কিছু কিংবা কিছুই নয়। সেও ওর সঙ্গে কেন বেরিয়ে গেল না? তার কি সাহস নেই? মনের আনাচে-কানাচে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সাহস তার আছে। হয়ত একজন জোয়ান কিংবা তানিয়ার চাইতেও বেশি।

বিকেল গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যার রঙিন আভা তার মুখকে ফুটিয়ে তুলল জানালায়। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। ডুবে গেল জানালার আঙ্গিক। ক্রমে রাত্রি গভীর হল। শেষ পর্যন্ত সারা পৃথিবী জাগল আরো একটা দিনের আলোকে, সময় নিরুদ্বিগ্ন গতিতেই বয়ে চলল। কিন্তু যে গেল সে আর ফিরে এল না।

দশটার আগেই তারা জানতে পারল আর কোনদিনই সে ফিরে আসবে না। খবরটা শুনে চিৎকার করে উঠলেন বুড়ো প্রফেসর, না না। তার ওপর যে আমার নতুন রিসার্চের ভার ছিলো! আমার রিসার্চের ভার ছিলো!

কয়েকদিন পর তিনিও বিদায় নিলেন।

আর মনীষা? সে কারো কাছে প্রশ্ন করল না। অভিযোগ জানাল না, একফোঁটা চোখের জল ফেলল না, কাঁদল না। তার মনের শিলায় উৎকীর্ণ করে রাখল কেবল একটা কথা ঃ ছুরিকাহত অবস্থায় অশোককে যখন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় দিদিমণি বলেছেন, সে এই বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল, মণি। আমায় ভুল বুঝোনা তুমি, তোমার কথা আমি রাখিনি। তবু আমার এই পরিণতির কথা তুমি যখন জানবে, জানি কাঁদবে তুমি। আমার অনুরোধ তুমি কেঁদো না। শেষকথা এই বলে যাই তুমি কিছুতেই দেশ ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। আমি এদেশের আলো-বাতাসে মিশে রইব নতুন মানুষদের মাঝে! তোমার আমার মিলন—

দিদিমণির কাছ থেকে কথাগুলো শুনে মনীষা ভেবেছে হাড়ে হাড়ে বিজ্ঞানী অশোক মৃত্যু মুহূর্তে কী নিদারুণ কবিত্বই না করে গেছে!

দূর-সম্পর্কীয় কাকাবাবু বললেন, অবস্থা এখন শান্ত। যাবে যদি চল আমাদের সঙ্গে।

আমি যাব না। মনীষা সমাহিত কণ্ঠে জওয়াব দিয়েছিল।

কেন যাবে না শুনি। কাকাবাবু বললেন, এখানে থাকলে তুমিও মরবে।

তা হোক এ আমার দেশ, আমার জন্মভূমি! কার ভয়ে চলে যাব?

কাকাবাবু মুখ ভেংচিয়ে উঠলেন, আহা-হা! খুব তো দেখছি দেশপ্রেম! এ-দেশপ্রেম নয় রোগ, রোগ! থাইসিস। হৃৎপিণ্ডেই সে থাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যায় শ্মশানে।

আপনারা যান। মনীষা বলল, এই অপবিত্র মাটিতেই আমাকে মিশে যেতে দিন্।

আচ্ছা! ঠিক আছে। কিন্তু যাবার সময় বলে যাই দেখ যদি তোমার—

মনীষা মন ঠিক করে ফেলল। হাসপাতালের সার্জন ছিলেন তার বাবার বিশেষ বন্ধু। তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বলল। নার্সিংয়ের কাজ নিল সেদিন বিকেলেই।

এ পর্যন্ত এসেই দিদিমণি চুপ করে গেলেন। তার মাংসবহুল থলথলে মুখে বিষাদের ছায়া। আমার মনেও তখন ঝড়ের আন্দোলন।

একটু সামলে নিয়ে জিগ্‌গেস করলাম, তারপর?

তিনি বলতে লাগলেন, তারপর আবার কি। তুমি ডিস্‌চার্জ হয়ে চলে যাওয়ার সপ্তাহখানেক পরেই নার্সদের স্ট্রাইক। যা বেতন তাতে কারুর চলে না। কর্তৃপক্ষকে

অনেকবারই বলা হয়েছে। তাঁরা কানও দেননি। শেষ পর্যন্ত সবাই ঠিক করল যতদিন দাবি মেনে নেওয়া না হবে ততদিন কেউ কাজে যোগ দেবে না। হলও তাই। কিন্তু এদিকে—

থেমে গেলন যে! বলুন, বলে যান।

না ভাবছিলাম তা বলা টিক হবে কিনা। জান তো পিছনে টিকটিকি লেগেই আছে। কখন কি বলি টুক্ করে লাগিয়ে দেবে। আর তাতে বুড়ো বয়সে চাকরিটা যাবে। যাই হোক এদিকে কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে নাশকতামূলক মনোভাব বলে ঘোষণা করলেন। সার্জন ওকে ডাকিয়ে নিলেন। জিগগেস করলেন তোমার কি অভিযোগ?

মনীষা বললে, মেমোরেণ্ডাম্ দেয়া হয়েছে!

তা তো দেখলাম। কিন্তু এ নেই, সে নেই এসব কি! সুখে থাকলেও একটা না একটা কিছু বলা চাই। এ তোমাদের একটা রোগ।

এ রোগের স্রষ্টা কে? ও জিগগেস করলে।

সার্জন দাঁত ঘষ্‌লেন। জওয়াব দিলেন না।

এরপর উপর থেকে ব্যাপারটার ওপর ইনকোয়ারী হল।

অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের চোখের সামনেই কয়েকজনকে এরেস্ট করে নিয়ে গেল। আমাদের দাবি কি, আর কেন, তা বুঝিয়ে বলার জন্যে হাসপাতাল গ্রাউণ্ডে তখন মিটিং হচ্ছিল। আর তাতে বক্তৃতা দিচ্ছিল মনীষা।

আশ্চর্য! আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল এই একটা শব্দ।

আশ্চর্যের কিছু নেই। জেলে পুরল, অপরাধ এদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা। কিন্তু জেলের দেয়ালে মনকে তো আর বেঁধে রাখা যায় না। তারা হাংগার স্ট্রাইক করল। ঠিক তিরিশ দিনের দিন মনীষা হার্ট ফেল করে!

দিদিমণির গলা ধরে এল।

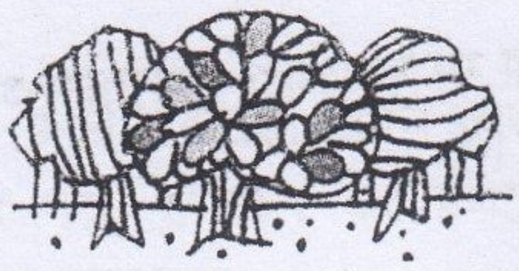
বলতে লাগলেন, সত্যি মেয়েটার আশ্চর্য মন ছিল। প্রথম যখন কাজে ভর্তি হয়, কিছুই জানতাম না, প্রায়ই কাজের কথা ভুলে যেত। তিরস্কার করলেও টু শব্দটি করত না, সারাদিনে খুব কম কথাই বলত। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতাম। পরিশেষে আবিষ্কার করলাম, অনেক রাত্রে ঘুম থেকে জেগে সে কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বালিশ ভিজিয়ে দেয় চোখের পানিতে। কারণ জিগ্‌গেস করলে বলতে চাইত না। পরে একরাত্রিতে সব খুলে বলেছিল। এরপর ওকে নিজের পেটের মেয়ের মতো দেখতে লাগলাম।

বড় বড় দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দিদিমণির চোখ থেকে, অজ্ঞাতেই আমার চোখের পাতাও ভিজে উঠেছিল।

মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে কোন্ পথে কখন অফিসে ফিরে এলাম বলতে পারব না। তার মৃত্যুর তারিখটা টুকে এনেছিলাম। এসেই পুরনো কাগজের ফাইলটা ঘাঁটতে লাগলাম। কিছুদিন ধরে, কাগজের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায়, খুব ছোট করে জেলে অনশন ধর্মঘটের খবর ছাপানো হয়েছিল। খুব ছোট করে, যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে। যন্ত্রচালিতের মতো, পাতা উলটিয়ে গেলাম। পাতার পর পাতা। হঠাৎ এক জায়গায় এসে চোখজোড়া স্থির হয়ে গেল। একটা ছোট্ট খবর, একজন মহিলা অনশনব্রতীর মৃত্যু।

এতক্ষণে খুব ভাল করেই মনে পড়ল, খবরটা আমিই কম্পোজ করেছিলাম।

অক্টোবর, ১৯৫০।



গুহাচিত্র

আমি ভুলতে পারিনি। কেন পারিনি সে রহস্য আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। তবে অতীতের সেই দিনগুলো খনির নির্জনতম কোণে দুর্লভ মণিখণ্ডের মতো আমার মনের গভীরে যে অক্ষয় হয়ে আছে, তা মাঝে মাঝে টের পাই। বিশেষ করে সারাদিনের কাজকর্মের শেষে যখন মেসের অপরিসর তক্তপোষে পাতা কঠিন বিছানাটায় শরীর রাখি, তখন নোংরা দেওয়ালটার দিকে চোখ পড়তে হাতের কাছের অন্য কোন সমস্যার চেয়ে সে ঘটনাটাই আগে জাগে অপরূপ।

অথচ কি বিরক্তিকরই না ঠেকেছিল সেদিন। রোম ধ্বংসের সময় নীরোর বীণাবাদনকে যদি কেউ সহ্য করে থাকে, তাহলে খুব বেশি খারাপ কাজ করেনি সে, কেননা সেখানে হয়তো ছিল সত্যিকারের বেদনা। কিন্তু তা বলে এমন সংকট মুহূর্তে ছেলেমানুষীকে তো কোনমতেই প্রশ্রয় দেয়া যেতে পারে না। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে রাগতস্বরে বললাম, আচ্ছা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

কেন, সেরকম কিছু পেলে নাকি? আমার মনের উষ্ণতাকে আঁচ করে মুখ না তুলেই প্রদোষদা জবাব দিল।

তোমার পা'য়ের ব্যাণ্ডেজটা আবার ভিজে উঠেছে রক্তে! বেঁধে নাওনা—

ডাক্তার আসার সময় হয়নি? তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর।

এরপর কী বলব ভেবে পাইনে। কতক্ষণ নীরব থাকার পর আবার মুখ খুলি, লেবুর রস আর লবণজলে গলাটা ভিজিয়ে নাও না?

লেবুর রস জখমের পক্ষে খুব উপকারী বুঝি? প্রদোষদা খল্‌খল্ করে হাসল। মুখ ঘুরিয়ে মনোরম ভঙ্গিতে বলল, জামাল, তুই দেখছি গিন্নিপনা শুরু করেছিস্, কিন্তু তার জানা উচিত, ও-কাজটিতে মেয়েদেরই কৃতিত্ব দাবি করবার একচেটে অধিকার!

আর রা করবার মুখ থাকে না। তবু যদি ইয়ার্ডে থাকতাম, তাহলে পৌনে তিনশ ডেটিনিউর উদ্ভাবনী শক্তি নিশ্চয়ই নতুন নতুন বিষয়বস্তু সৃষ্টি করে চলতো, আর তার মাঝখানে একটি লোকের খেয়ালিপনায় মনোযোগ দেবার সময়ই পাওয়া যেত না। কিন্তু এখানে চুপ করে থাকা অসম্ভব। চুয়াল্লিশটা সেল পাশাপাশি একসারিতে থাকলেও প্রত্যেকটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এমনকি সম্মুখ দিক দিয়েও একেকটি যেন দূরবর্তী অন্ধকার গুহা। সাথীদের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলবার দরকার হলে দরজার মোটা লোহার শিকের কাছে মুখ রেখে চেঁচাতে হয়। অনেক সময় কণ্ঠস্বর ভেঙে যায় দেওয়ালের ঝাপটায়। বাইরের পাকা সমতল থেকে ভেতরকার মেঝে কিছু উঁচু হলেও, কুঠরির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এত কম, পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এলে সমস্ত ঘর হয়ে ওঠে নির্জন পাহাড়ের অনধ্যুষিত গহ্বরের মতো। দু'শ বছর ধরে অনেককেই যে এখানে দুর্যোগের দিন যাপন করতে হয়েছে, তার চিহ্ন একেবারে মুছে যায়নি। পালিশ করা পলেস্তারার গাত্রে নানা উপায়ে লেখা রয়েছে অনেক নাম, আর সে-সঙ্গে হয়তো কোন বন্দীর চরম হতাশায় শক্তি সঞ্চয়ের সংযত ইতিহাস—ডোণ্ট ফীল এলোন্ হিয়ার।

দৈনিক দুবার করে তালা খোলা হয় সেলের। হাত-মুখ ধোয়া কিংবা গোসল করবার জন্যে। একবার সকালে। আরেকবার বিকাল পাঁচটায়। তাও আবার ঘণ্টাখানেকের জন।

এই নির্দিষ্ট সময়টুকু ছাড়া প্রত্যেকটি সেলে দু'জন করে একা। কথা না বললেও। কাঁদলেও, হাসলেও। চিরাচরিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদের ফল এই।

কিছু না পেয়ে বললাম, আচ্ছা, এসবে তুমি কি সুখ পাও?

জানি না। অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থেকে অবশেষে সমাহিত গলায় বলল, তবে এটুকু বলতে পারি, আমার অবস্থায় পড়লে যে-কোন মানুষ এমনি করত।

কেন কী হয়েছে তোমার? কণ্ঠস্বরে কৌতূহল মিশিয়ে জিগগেস করলাম।

তার শীর্ণ হাতটা তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে দেয়ালের ওপর। একেকবার হেঁচকা টানে কাঠকয়লার মাথাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে! হাঁ, এতক্ষণে কিছু বোঝা যাচ্ছে, একটি মেয়ের আবক্ষ প্রতিকৃতির খসড়া। সমতল দেয়ালের ওপর কালো রেখায় এলোমেলো খোলাচুল মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ছে, আর তার মাঝখানে ঈষৎ গোলাকার মুখটা স্থির হয়ে আছে। চোখদুটোতে বিষাদের ছায়া। ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরে, যেন সহ্য করে নিচ্ছে কোন অজানা গভীর যন্ত্রণা। বাকি রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি।

প্রদোষদার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। হাত কাঁপছে, কাঠকয়লার টানটোনে তার হাত শিরশিরিয়ে কাঁপছে। দেয়ালে, রেখায়, আঙুলে যেন এক শব্দহীন অদৃশ্য সংগীত। তার চোখ এমন প্রশান্ত উজ্জ্বল হতে আর কখনো দেখিনি, ফ্যাকাশে তারা দুটো আনন্দের অস্পষ্ট বেদনায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে। আর সারা মুখমণ্ডলে এক মুখর স্তব্ধতা।

এখানে আলোর কোনরূপ ঝামেলা নেই। সেলের ভিতর থেকে শিকের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, কিছু দূরে বড়ো প্রাচীরের ওপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো শিশু গাছের পাতাগুলো জড়িয়ে আসছে, সন্ধ্যা-সূর্যের শেষ হৃৎস্পন্দনটুকু প্রশাখাকে রাঙিয়ে যাচ্ছে। বাইরে চারদিকে ফর্সার আভা। তবু এখানে প্রায় অন্ধকার। প্রদোষদার কাঁধ স্পর্শ করে বললাম, রাত হয়ে গেছে। এবার থামোনা।

রাত? কোথায়! মুখ না ফিরিয়েই বলল, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

দেয়ালটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু আঁকা রয়েছে কিনা, তা অনুভব করা অসম্ভব। অথচ এ যে কিভাবে এখনো পুরোদমে হাত চালিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারিনে।

ইয়ার্ডে থাকতে একদিন বিকেলে জানালার ধারে বসে যেসব কথা বলেছিল, বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে সবই নানাজনের কাছে বলতে শুনেছি। চলনে-বলনে তার নাটুকে ভাবটা পুরনো। জিনিশকেও করে তুলত নতুন। ও বলত, প্রত্যেক মহৎ সৃষ্টির জন্মমুহূর্ত, সময়ের সরলরেখায় একেকটি সূর্যবিন্দুর মতো। সে একক, অনন্য। পৃথিবীতে পাহাড় আর পাথরের অন্ত নেই, কিন্তু যে মুহূর্তে পাথরের বুকে ভেনাসের প্রতিষ্ঠা, সে মুহূর্তে পাথর আর পাথর রইল না, হল জীবন। আর এসব মুহূর্তের জন্যেই সম্ভব হয় মর্তলোকে এথেন্সের মতো নগর নির্মাণ। অনেক কিছুই দুহাতে এনে জড়ো করলে, রং, তুলি, ক্যানভাস, কোনটারই অভাব রইল না, কিন্তু যখন সে মুহূর্তটি এসে যাবে তখন উপলব্ধি করবে, এসবই অর্থহীন। তখন নিজেই একটি রং। নিজেই একটা সুর। নিজেই কাব্য।

এ সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বের অর্থ বোঝবার মতো মাথার ঘিলু আমার কোনকালেই ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে চুপ হয়ে শুধু শুনেছি, আর তার দেয়া সিগারেট একটার পর একটা পুড়িয়েছি।

অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হল। কলটা গলা ইস্তক টেনে চুপ হয়ে আছি দেয়ালে ঠেস দিয়ে। লোকটা এখনো করছে কী! এতক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসেছিল, এবারে দাঁড়িয়ে উঠেছে, চোখদুটো দেয়ালের কাছে নিয়ে আস্তে আস্তে গভীর মনোযোগের সঙ্গে হাত চালাচ্ছে।

উপোস করে শরীরটা এমন ক্লান্ত এমনিতেই চোখ বুঁজে থাকি। হঠাৎ এক সময় একটা শব্দ হল, ও পড়ে গেছে। যন্ত্রচালিতের মতো উঠে গিয়ে তাকে ধরলাম, সঙ্গে সঙ্গে জিগগেস করলাম, লেগেছে?

না। প্রদোষদা বলল, আমাকে শুইয়ে দে।

এরপর নীরবতা এল। বড্ড ঠাণ্ডা। একে তো এ ডিসেরের মাঝামাঝি, তার ওপর প্রত্যেকের দুটো করে কল, সেগুলোতে লোমের চাইতে ধূলোর ভাগই বেশি। আর দুটো কলই যদি ব্যবহার করা যেত তাহলে না-হয় কিছুটা সুরাহা হত, কিন্তু তা হবার উপায় নেই। দুটোর মধ্যে একটিকে ভাঁজ করে বালিশ করতে হয়, খালি মেঝেয় মাথা রেখে তো শোওয়া যায় না। এদিকে আবার দরজার কোনো কপাট নেই, কেবল শিক। তিনদিকে অনুচ্চ দেয়ালের ঘের অবশ্য আছে, কিন্তু তাতে বাইরে বেশি শীতল ঝিরঝিরে হাওয়ার অভিসার রোধ হয় না। রাত বেশি হয়নি, তবু কলের ভিতরে গুটিপোকার মতো কুঁকড়ে পড়ে থাকাই একমাত্র গতি। চোখ বুঁজে থাকতে সেন্ট্রির ভারী বুটের মৃদুসঞ্চালনের আওয়াজ কানে বাজে।

হা-হা হা! আমি শিল্প হবো, শিল্পী! এক সময় খলখল করে হেসে ওঠে প্রদোষদা।

আমি হকচকিয়ে উঠলাম, একি তুমি ঘুমাও নি!

ঘুম! ঘুমাব কেন? কলের ভিতর থেকে নড়েচড়ে উঠে খ্যাপার মতো বলল, শোন্ জামাল, একটা সত্যি ঘটনা শুনবি! না, ঘটনা নয়, গল্প। আজ তোকে গল্প শোনাব।

বেশ শোনাও। তাচ্ছিল্যের স্বরে বললাম।

কিন্তু কথা দিতে হবে তুই হাসতে পারবিনে।

দিলাম।

তাহলে শোন্। কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রদোষদা বলতে লাগল, আমি শিল্পী হবো। ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন আর সংকল্প ছিল আমি শিল্পী হবো। গানের শিল্পী নয়, কবিতার শিল্পী নয়, যাকে বলে আর্টিস্ট। আমার বড়দি মাছের আঁশ দিয়ে একটা ময়ূর তৈরি করেছিলেন, আমার মনে হত, ময়ূরটা এখনি বুঝি পেখম তুলে নেচে উঠবে। আমার মার আলপনা যে দেখেছে, শত কাজ থাকলেও তাকে একটু না দাঁড়িয়ে উপায় ছিলনা। বাবা ছিলেন কাঠখোট্টা লোক, তবু কাছারিতে সারাদিন কলম পিষে এসে অধিকরাত্রে বেহালা বাজাতেন। আমি উৎসাহ চেপে রাখতে না পেরে একদিন বাবার হিসেবের খাতায় একটি নৌকা এঁকে দিয়েছিলাম। বাবা এর গুণগ্রাহী হতে পারলেন না। রাতে এসে কাছে ডেকে নিয়ে কানটা লাল করে দিলেন।

ম্যাট্রিক পাস করার পর আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হবার ইচ্ছা জানাতেই বাবা চটেমটে আগুন। বললেন, এসব হবে টবে না।

মা আমার পক্ষে ছিলেন। মিন্‌মিন্ করে বললেন, ছোটবেলা থেকেই এদিকে ঝোঁক—

রাখো তোমার ঝোঁক। ছবি আঁকলে ভাত আসবে না! তিনি রাগে গর্‌গর্ করতে লাগলেন, দেখেছি, অনেক দেখেছি। নিজের জীবন দিয়েই দেখেছি। রঙিন মধুর ভাবনা কিছুই থাকে না। আমারও সাধ কম ছিল নাকি—ভাবতাম, হবো মোৎসার্টের মতো সেরা কম্পোজার! খুব হয়েছি। যত সব—

সেদিন কেঁদেছিলাম। কোন উপায়ই যখন রইল না, একদিন রাত্রে বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ইস্টিশন বেশি দূরে নয়। পকেটে শিয়ালদা পর্যন্ত গাড়ি ভাড়াটাও নেই। সল শুধু গায়ের স্লার্ট, পরনের ধুতি, আর একটা রুমালে বাঁধা কয়েক আনার পয়সা।

তাও আমার দিদির বাক্স থেকে চুরি করে আনা। কোনো বাধাই আমাকে আটকে রাখতে পারবে না, আমার চোখে স্বপ্ন, ছবি আঁকা শিখতেই হবে। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার তুলির টানে কালের পটে অমর হয়ে থাকবে।

আমি প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। আর এর মূলে ছিল একটি লোক, যিনি অসম্ভব আজগুবি গল্প বলতে পারতেন, ইনিয়ে বিনিয়ে, রং ফলিয়ে। তিনি হলেন আমাদের ইস্কুলের ড্রয়িং মাস্টার। লোকটা অদ্ভুত। বিয়ে করেননি। যুবাবয়স থেকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন, মণিপুরের পাহাড় এলাকা থেকে মহেঞ্জোদাড়ো, কৈলাসের তীর্থ থেকে কুমারিকার সেতুবন্ধ পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক স্থানই বাদ যায়নি। তাজমহল দেখে তিনি মূর্ছা গিয়েছিলেন, কোনারকে হয়েছিলেন ধ্যানস্থ। একটি জিনিশেরই তিনি প্রশংসা করতেন সবচাইতে বেশি। সে হল প্রাচীন যুগের স্থাপত্য। তিনি বলতেন, সে যুগের এসব কীর্তির কথা যখন ভাবেন, তখন মনে হয়, গর্বে তাঁর শির সুউচ্চ লৌহস্তম্ভের মতো আকাশেল দিকে উঠে গেছে। তাঁর মুখটাও ছিল, পাথরে-খোদাই মূর্তির মতো, অমসৃণ, এবড়োখেবড়ো।

যদিও তিনি মন্ত্রণা দেননি, তবু বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার প্রেরণাটা পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকেই। কিন্তু শহরে এসে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল।

মামার বাসায় ওঠা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মামীর কোন ছেলে না থাকায় স্নেহের একটা বিরাট ফাঁক পাওয়া গেল, বললেন, গৌরীকে পড়াবি, থাকবি। ভর্তির টাকার জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু সাবধান তোর মামাকে বলিসনি যেন। তিনি এসব পছন্দ করেন না।

এটুকু বলে প্রদোষদা থাকলে। কোন কিছু জিগগেস করবার মতো সামর্থ্যও আমার নেই, রাজবন্দীদের ওপর অন্যায় পুলিশী হামলার প্রতিবাদে অনশন ব্রতের কাজ সাতদিন চলছে, ক্ষুধায় শীতে সমস্ত শরীরটা যেন ক্রমশ বরফ হয়ে যাচ্ছে। চোখ বুঁজে শুধু কান দুটো সজাগ রেখে পড়ে রইলাম, তখন রাত্রি মাত্র আটটা হয়েছে। পাহারার জন্যে আরো কয়েকটা সেপাই এসেছে। বিড়ির কড়াগন্ধ ভেসে এলেও তাকে পৃথিবীর অন্যতম দুর্লভরত্ন বলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রদোষদা আবার শুরু করলে, এরপর তিনটি বছর বাদ দিয়ে যাব। এ-তিন বছরে অনেক কিছুই হয়েছে, সে-কাসুন্দি ঘাঁটতে গেলে এক মহাভারত হয়ে যাবে। তিন বছর পরের কথা বলছি।

এতদিনে এইটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি, শিল্পের জগৎ এক আশ্চর্য রহস্যের রাজ্য। সে যেন রূপকথার এক দেশ। যত এগিয়ে যাবে ততই নতুন নতুন পথের বাঁক। নতুন নতুন দিগন্তের ডাক। সেখানে শৈথিল্যের কোনো স্থান নেই। একটু পিছিয়েছ তো রূপকথার গল্পের সেই ডাকিনী—যোগিনীদের শাপের মতো তুমি স্তব্ধ পাথর হয়ে যাবে। এমন জগতে আমি প্রবেশ করেছিলাম গর্বোদ্ধত বুকে। মনে করেছিলাম, হেলায় লঙ্কা জয় করে নেবো। কিন্তু যতই এগুলাম দেখি আমি সেই জগতের রথী-মহারথীদের তুলনায় অপোগণ্ড বালক মাত্র। দা ভিঞ্চির কথা শুনেছ? শুনেছ মাইকেল এঞ্জেলোর কথা? জীবনের সকল তিক্তরস পান করে ওঁরা নীলকণ্ঠ হতে পেরেছিলেন বলেই না তাঁদের সৃষ্টি অমর হতে পেরেছে। ওঁরা তো একেকটা গিরিশৃঙ্গ, ওঁদের উচ্চতা দূর থেকে দর্শন করে বিস্মিতই শুধু আমরা হতে পারি। সেদিনকার মানেঁ, রেমব্রাঁ, সিজান, গগাঁ, ভ্যান গ ওঁরাও কম যায় কিসে? ওঁরা ছিলেন বলেই না এ যুগের পিকাসোর মানস-বিস্তার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়েছি ওঁদের জীবনকাহিনী, একেকটা জীবন্ত শিল্পকর্ম, যার জুড়ি কোনো সিস্টাইন চ্যাপেল দিতে পারবে না! নিজের মনেই হেসেছি, কেঁদেছি। পরম এক তৃষ্ণা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। সাফল্যের কোনো

সম্ভাবনা না দেখে মাথার চুল ছিঁড়েছি। সৃষ্টি সৃষ্টি, আমাকে সৃষ্টি করতে হবে।

এই রকম যখন মানসিক অবস্থা, তখন একদিন দৈবনির্দেশেই যেন পেয়ে গেলাম আমার শিল্পের মানসপ্রতিমা। আমার দেহমন পাওয়ার বেদনায় উন্মুখ হয়ে উঠল।

আমাদের লাইফ ক্লাসে যেসব কাজ করানো হত তাতে আমার মন ভরত না। আমি কেবলই ভাবতাম, মডেল চাই। রক্তমাংসের মানুষ ঃ নারী! আমাকে মডেল খুঁজে বের করতেই হবে।

এখানে বলে রাখা ভালো, গৌরীকে আমি ভালবাসতাম। সে সামনে এসে বসলে সবকিছু ভুলে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম। তার বয়োসন্ধির নিষ্কলুষ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করত। কিন্তু শিল্পের এত যে তীব্র অনুভূতি, তা এর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এমন মেয়েকে নিয়ে সুখে ঘর করা যায়, স্রষ্টা হওয়া যায় না।

সেদিন ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরছি। রাত হয়েছে। একমনে চলছিলাম, একসময় পাশে একটা হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, হি হি হি। বাবু একটা বিড়ি দেনা।

একটা ভিখারিণী। বললাম, নেই।

নেই? নেই কেন? হঠাৎ আমার হাত ধরে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সে বললে বাব্বা, বাবুর দেখি গোঁফ উঠেছে। তাতে আবার সাধু পুরুষ।

মেয়েটার ধৃষ্টতায় গা জ্বলে উঠল। ভাবলাম, দেই কষে একটা চড়। কিন্তু পারলাম না। এ ঝামেলাকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। বললাম, ছেনালিপনা ছাড়িয়ে দিতে পারি।

তাই নাকি? হি হি হি। যাদু আমার বলে কিগো। এবার মেয়েটি আমার সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে চেয়ে রইল! সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি।

হাঁ, একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। তখন তেরোশ পঞ্চাশ। ডাস্টবিনের ময়লা নিয়ে কুকুরে-মানুষে কামড়াকামড়ি। নগরের রাস্তায় হাঁটা যায় না। বুভুক্ষু নরনারী শিশুর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ছেয়ে যাচ্ছে।

আমি কট্‌মট্‌ করে বললাম, পথ ছাড়।

বললে, পয়সা দে। আমি খাব!

বললাম, নেই।

ও বললে, মিছে কথা।

ভিখারিণীর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হলাম। সেখানে স্পষ্ট দৃপ্তভঙ্গি। ছেঁড়া ময়লা কাপড়, শণের মতো তৈলহীন উস্‌কোখুসকো চুল, গ্যাসপোস্টের কাছাকাছি থাকলেও এতক্ষণ ভালমতো দেখিনি। এবারে দুচোখ বিস্ফারিত করে চাইলাম।

আমি ভুল করিনি। সত্যি আমি ভুল করিনি এতটুকু। চট্‌ করে আমার মাথায় খেলল, হাঁ এ তো আমার মডেল হতে পারে! ঝড়ের বাতাসে উড়ে এসেছে, তাই চেহারায় চাকচিক্য নেই, কিন্তু দেহের কি আশ্চর্য সুন্দর কাঠামো। ভেনাসের ভাস্কর্যের ছাপানো প্রতিলিপি আমি অনেকবার দেখেছি, তার সঙ্গে এর কোথায় যেন একটা নিবিড় সাদৃশ্য আছে। তাকে স্থির দাঁড় করিয়ে, একটু দূরে গিয়ে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখলাম, না আমি ভুল করিনি।

এ কয়েক মুহূর্ত মাত্র। আবার সামনে গিয়ে বললাম, হাঁ, পয়সা দিতে পারি। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।

হি হি হি কাজ!

পারবে? মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে নিলাম।

পারব না কেন? হি হি হি। ওই যে চা দোকানের মিনসে, ও আমাকে ধরে নিয়ে

গিয়েছিল, বলেছিল খেতে দেবে, কাপড় দেবে। মাগো মা, আমি তো প্রথম ডরে জমেই গিয়েছিলাম। এখন আর ডরাই না। ওই যে বাঁদরমুখো লাল সৈন্য তিনটা, ওরা আমায় দশ টাকা দিয়েছিল! হি হি হি।

মাথা খারাপ! ওসব কিছু নয়। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, যাবি তো চল্!

বাইরে সাহসীর মতো কথা বললেও বুকের ভিতরটা ঢিব্‌ঢিব্ করছিল। মামা মামীরা যদি কেউ টের পায়, তাহলে কম্মকাবার। তবু কিছুটা রক্ষে, আমার শোবার ঘরটা বাইরের দিকে। বৈঠকখানার একপাশের একটি কামরা। মনে দ্বন্দ্ব, আর সংশয়। না এ পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে।

পিছনে একটু দূরে দূরে আমাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে জোরে পা চালিয়ে দিলাম। একটা গলি পেরিয়েই মামার বাসা। তখন রাত দশটা বেজেছে। জানি, আমার জন্যে চিন্তা করবে না কেউ। কেননা, প্রায়ই এগারোটা-বারোটায় বাইরে থেকে ফিরি। আমার বরাদ্দ খাবারটা টেবিলের ওপর বই-চাপা দেয়া থাকে। কামরায় ঢুকে খিল এঁটে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, টু শব্দটি করেছ তো, গলা টিপে মেরে ফেলব। আমি যা বলব, তাই করবে।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সে চুপ হয়ে রইল। রাস্তার পেত্নিটা যেন তার মাথা থেকে নেমে গেছে। এখন প্রায় স্বাভাবিক চেহারা। শীর্ণমুখে বিষাদের ছায়া। সে কী ভাবছে?

কাপড় বদলাতে গিয়ে বললাম, ওখানে খাবার রয়েছে। জলদি করে খেয়ে নাও।

মেয়েটা যন্ত্রচালিতের মতো উঠে এল। বলল, তুমি খাবে না?—

কথা থামিয়ে নড়াচড়া করে উঠে বসল প্রদোষদা। নতুন করে যেন তার শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে পাদুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে বসে বলতে লাগল, সেই রাত্রি। আমার জীবনে সে এক পরম লগ্ন। বিধাতাপুরুষ যেন আমাকে ঘাড়ে ধরে বসিয়ে দিলেন, আমার শক্তির পরীক্ষা করতে। এ সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করতে পারিনে।

ইজেল রংতুলি ঠিক করে সামনে বসে বুঝিয়ে দিলাম তাকে কী করতে হবে। সে মনোযোগ দিয়ে শুনল।

আমার বক্তৃতায় একটু শ্রদ্ধার ভাবও ফুটে উঠেছে চেহারায়। কোথায় মিলিয়ে গেছে সকল বন্যতা।

এক পা দুপা করে এগুতে হবে। প্রথমেই ন্যুড আঁকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলে হয়তো কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলবে। ম্যাডোনা পরিকল্পনার জন্যে সিটিংদের ঠিক করলাম। আমার কাণ্ড দেখে সে একেবারে থ বনে গেছে।

সব ঠিকঠাক। টুলের ওপর বসিয়ে কোলের কাছে ধরতে দিলাম একটা পুতুল, ছেঁড়া কাপড়ের ভিতর থেকে স্তনের বোঁটটা বেরিয়ে পড়েছে, আর নিচ থেকে ক্ষুধার্ত শিশুটা প্রাণপণ শক্তিতে তা কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে, হাত পা ছুঁড়ছে, কিন্তু পারছে না, মায়ের চুল জটপাকিয়ে মুখের দুপাশ দিয়ে কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, ভুরু তার কোঁচকানো, ওপরের দিকে বিষাদক্লিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে তার এতটুকু করুণার অপেক্ষা করছে;—এমনি একটা পরিকল্পনা। হারিকেনের আলোটা এমন এক জায়গায় স্থাপন করলাম, যেখান থেকে দারিদ্র ও হতাশার মর্মান্তিক ভয়াবহতা তার দেহে ফুটে উঠতে পারে।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুলি টেনে নিলাম।

তার দিকে চেয়ে বললাম, চমৎকার।

আমার কাজ এগিয়ে চলল। এতদিন যা শিখেছি তার সব ঢেলে দিলাম রঙের সঙ্গে মিশিয়ে, তা চিরকালের অবিনশ্বর রসমূর্তি হয়তো হবে না, কিন্তু এতেই থাকবে আমার

হৃদয়ের অনেকগুলো রক্তকণিকার স্বাক্ষর। আমি এখন একাগ্র। আমি আত্মস্থ।

না, না! আমি ছাড়ব কেন? কেন? হঠাৎ মেয়েটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, মাটির পুতুলটা তার কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। তা ভেঙে গেল খানখান হয়ে।

আমি গিয়ে মুখ চেপে ধরলাম, চুপ! চেঁচাবে তো গলা টিপে মেরে ফেলব।

মেয়েটা আমার হাত ছাড়িয়ে কাঁপিতে লাগল। তার চোখমুখ একমুহূর্তে বদলে গেছে। আমার সামনে এসে বসে পড়ে বলল, মার্ মার্। আমাকে মেরে ফেল। ওরা আমার বুকের ধনকে কেড়ে নিয়েছে আমার নয়নের পুতলি। সোনামণি, খোকন আমার!

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি মাটিতে লেপটে পুতলি। আমি হতভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনো কথাই মুখে এল না। হঠাৎ আবার সে উঠে বসে চোখ মুছে কঠিন হযে দাঁড়াল। উচ্চ ফিস ফিস্ করে সে বলতে লাগল, কিন্তু কেন? আমার দুঃখটা কিসের? শ্বশুর যখন ফ্যানফ্যান করতে করতে মরে যায়, আমি কাঁদিনি, শাশুড়ি পুকুরে ডুবে মরল, আমি কাঁদিনি! সাতদিনেও যখন এক মুঠো ভাত জোগাতে পারল না, শাজাহান চুপি চুপি ফাঁস নিল। যেন আমাকে ফাঁকি দেবে। আমি যে তার মমতাজ গো! সেই মীরপুর স্কুলে মাস্টারি করত, বেচারা!

রুমাল দিয়ে ঘাম মুছলাম কপালের।

ও মরল। তখনো আমি কাঁদিনি। কেন কাঁদব? গাঁয়ের সবাই বলল, শহর, শহর। শহরে গেলে বাঁচা যাবে। আমি খোকাকে কাঁধে তুলে নিলাম। চুমো খেয়ে বললাম, তোকে বাঁচাব। কিন্তু পারলাম না, সবাই মরে যাচ্ছে কেমন করে বাঁচবে।? সন্ধ্যার অন্ধকারে একজন শিস দিল, একটা প্রস্তাব করল। আমি রাজি হলাম। কেন হব না? কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ তার প্রমাণ?

এরপর মেয়েটি যে কাণ্ড করে বসল, আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তার সারা শরীর চাকলা চালাক হয়ে গেছে, নাভির নিচে ঘা। এ একটা বিশেষ রোগের লক্ষণ, চিনতে কষ্ট হল না।

আঁক্, আঁক্ এবার ছবি আঁক্। ন্যাংটা ছবি! আমার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল সে, তারপর দ্'গালে দুটো চড় মেরে বলল, লজ্জা করে না?

প্রদোষদা সে রাত্রে আর কোন কথা বলেনি। কেবল ঘুমোবার আগে তন্দ্রাজড়িত গলায় উল্লেখ করেছিল, সেদিন থেকেই তার শিল্পীজীবনের শুরু, আর এখানকার বাসবরণ সে পথেরই নতুন দিগন্তের ডাকে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার ব্যাখ্যার মর্মগ্রহণ করতে পারিনি তখন। মাঝরাত্রি পেরিয়ে গেছে, সেন্ট্রির বুটের আওয়াজ শ্লথ আর ভারী হয়ে উঠেছে। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেয়ালের দিকে চোখ পড়ল। এক অবাক কাণ্ড। অন্ধকারে প্রদোষদা দিব্যচক্ষু লাভ করেছিল? না হলে অবশ শরীরে হাতড়ে হাতড়ে কাঠকয়লার আঁচড়ে এমন শিল্পসৃষ্টির খসড়া কেমন করে সম্ভব? রাত্রির কাহিনী মনে করে দেখলাম, বহু বছর আগে পরিকল্পিত তার মাতমূর্তি কালো রেখার টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আদিমাতার কোলে আদি মানবশিশু। সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে একটি ঝড়কে তুলে এনে যেন চল্লিশ নম্বর সেলের দেয়ালে গেঁথে দেয়া হয়েছে। অজানা গাঁয়ের ইস্কুল মাস্টারের বৌ মমতাজের সঙ্গে এই মাতৃমূর্তির কোথায় যেন আশ্চর্য মিল। আমি উঠে বসে মুগ্ধদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলাম। তখনো ভাঙেনি প্রদোষদর ঘুম।

মার্চ, ১৯৫১